প্রবাস বন্ধু

১৪২৬ শারদীয়া সংখ্যা

১৪২৬ : প্রবাস বন্ধু : সূচিপত্র : শারদীয়া সংখ্যা : 2019

সম্পাদকীয়	মালবিকা চ্যাটার্জী (হিউস্টন, টেক্সাস)	3
গদ্য		
'একলা চলো' - মন্ত্রসিদ্ধ বিদ্যাসাগর	সুমিতা বসু (হিউস্টন, টেক্সাস)	5
শ্রদ্ধার্ঘ্য: সহজ ভাষার কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায় (শিকাগো, ইলিনয়)	9
টেক্সাসে রবীন্দ্রনাথ	মৃণাল চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	12
বিশ্বের দুঃসাহসী	অসিত কুমার সেন (অস্টিন, টেক্সাস)	16
প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমাজমানস	শেলী শাহাবুদ্দিন (মাউন্টেন ভিউ, ক্যালিফোর্নিয়া)	18
অনুগল্প	ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (কলকাতা, ভারত)	22
উত্তরণ	জয়শ্রী বাগচী (দিল্লী, ভারত)	25
ভূল শংসোধন	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	28
অসম্ভব	সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায় (হিউস্টন, টেক্সাস)	50
ফিশফ্রাই ও তালের বড়া	ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত (কলকাতা, ভারত)	51
অশনি সংকেত	বৈশাখী চক্কোত্তি (কলকাতা, ভারত)	53
একদা এক বাঘের সাথে...	বলাকা ঘোষাল (হিউস্টন, টেক্সাস)	56
দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে	কৃষ্ণা গুহ রায় (কলকাতা, ভারত)	58
আশুবাবুর প্রেম	শুভা আঢ্য (অস্টিন, টেক্সাস)	60
পরিকল্পনা	হুসনে জাহান (স্যান হোসে, ক্যালিফোর্নিয়া)	64
একটি মামুলি ঘটনা	পুষ্পা সাক্সেনা - অনুবাদ: সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	68
কবিতা		
কোনও এক রাত্রির শ্রাবণে, সেই কান্না, অসম্পূর্ণ কবিতা	উদ্দালক ভরদ্বাজ (হিউস্টন, টেক্সাস)	33, 45, 72
দেয়ানেয়া, স্বপ্ন, অবুঝ	মিশা চক্রবর্তী (হিউস্টন, টেক্সাস)	33, 47, 49
Greta Thunberg-এর মনের কথা, কবিতার মৃতদেহ	সুজয় দত্ত (ক্লিভল্যান্ড, ওহাইও)	34, 47
প্রবাস বন্ধু, মনসংগীত ১, মনসংগীত ২	অচিন্ত্য কুমার ঘোষ (হিউস্টন, টেক্সাস)	35, 42, 48
অমোঘ সত্যি হয়তো, স্বপ্নরা প্রহর গোনে	সুজাতা দাস (কলকাতা, ভারত)	35, 43
পরবাসী, শ্রাবণ-ধারা	নমিতা রায়চৌধুরী (হিউস্টন, টেক্সাস)	36, 44
যখন বৃষ্টি আসে, এক আঁধার রাতের প্রতীক্ষা	আলী তারেক (হিউস্টন, টেক্সাস)	36, 46
গোলকমঙ্গল কথা	কৃষ্ণকুমার শর্মা (অস্টিন, টেক্সাস)	37
অস্তরাগ, কালবৈশাখী	সফিক আহমেদ (হিউস্টন, টেক্সাস)	38, 48
প্রবাস বন্ধু, মাতা-সন্তান-পিতা	রঙ্গনাথ (হিউস্টন, টেক্সাস)	39, 44
উৎসব, অসুখ	দেব বন্দ্যোপাধ্যায় (অ্যান্ আরবার, মিশিগান)	39, 45
যাপন, বৃষ্টি	রত্না ব্যানার্জী (শিলিগুড়ি, ভারত)	40, 49
ভালবাসা স্মৃতি হয়ে যাবে	স্বপ্নেন্দু ভৌমিক (কলকাতা, ভারত)	40
শান্তিনিকেতন	জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় (শান্তিনিকেতন , ভারত)	41
সবার শরৎ	কমলপ্রিয়া রায় (অগাস্টা, জর্জিয়া)	41
হিসেবে ছাড়া	শঙ্কর তালুকদার (শান্তিনিকেতন, ভারত)	42
সোনার মেয়ে স্বপ্না বর্মন	ডলি ব্যানার্জী (দার্জিলিং, ভারত)	43
অন্ধ সময়ের পাঁচালী	অজয় সাহা (কলকাতা, ভারত)	46

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা

আশ্বিন ১৪২৬, অক্টোবর ২০১৯

প্রকাশনায়: প্রবাস বন্ধু পাঠচক্র সভ্যবৃন্দ

প্রচ্ছদ

সংযুক্তা দত্ত

সহযোগিতায়

চন্দ্রা দে

রূপছন্দা ঘোষ

নমিতা রায়চৌধুরী

ভজেন্দ্র বর্মন

অসিত কুমার সেন

মুদ্রণ সহযোগিতায়

শুভেন্দু চক্রবর্তী

মৃণাল চৌধুরী

সম্পাদনায়

মালবিকা চ্যাটার্জী

সুজয় দত্ত

শিল্পী : রুমানি নাথ কোনার

সম্পাদকীয়

জগৎ চালাবার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে জগতেরই প্রাপ্তবয়স্করা। সবক্ষেত্রেই যে দেখি তাঁরা সঠিক পথে চলছেন, তা নয়। অনিয়ম আর দুর্নীতির বেশিটাই চোখ সওয়া হয়ে দাঁড়ায়, বিক্ষোভ থাকলেও মেনে নেওয়া ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না সাধারণ জনতা। কিন্তু এরই মধ্যে জ্যোতিষ্কের মতো কিছু উজ্জ্বল শিশু চরিত্র পৃথিবীর কোলে বরাবর আশার ঝান্ডা হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়।

আমাদের দেশ থেকেই শুরু করি - ইংরেজ শাসন যখন অত্যাচারের তুঙ্গে, তখন বহু পরিণত বয়সী স্বদেশীদের সঙ্গে সমমাত্রায় বিদ্রোহ জানায় বালক ক্ষুদিরাম, সুভাষ এবং আরো অনেক অল্প বয়স্করা, যারা এদের সঙ্গে বন্ধুর মতো পাশে দাঁড়িয়েছিল। অনেককে অল্প বয়সেই প্রাণ হারাতে হয়েছিল, অনেকে প্রাপ্ত বয়সেও তাঁদের কর্ম অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

দেখি, একদল মানুষ বন্দুকের স্বপক্ষে লবি ক'রে, আর বহু অর্থ অপচয় ক'রে নেতৃস্থানীয়দের মুখে কুলুপ এঁটে দিয়েছে। অপরদিকে দেখি gun control-এর স্বপক্ষে দাঁড়াতে মার্কিন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের।

সেই ছোট্ট মেয়েটি, যে প্রাণীহত্যা সমর্থন করে না মোটেই, সে নিজে খাবে না কোনরকম মাংস এবং অন্যদের খেতে দেখেও তার কান্নায় ভেঙে পড়ার দৃশ্য।

সম্প্রতি সুইডেনে ১৬ বছরের মেয়ে Greta Thunberg- এর গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিবাদ নাড়া দেয় সারা বিশ্বের জনতাকে।

এই অল্প বয়স্করা সকলেই জগৎকে সঠিক পথের আলো দেখায়, এরা ভবিষ্যতের দিশারী। এদের সর্বতঃ বৈধ সরব প্রতিবাদ বড়দের মনের কোথাও একটু চেতনার আভাস জাগায় তো অবশ্যই!

বাংলার সন্তান শ্রী অভিজিৎ ব্যানার্জী বর্তমানে এম আই টি-র অর্থনীতিবিদ। এই বছরে তিনি অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার জিতে ভারতীয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তের তালিকায় আর একটি নাম যোগ করলেন।

শারদীয়া সৌহার্দ্যের সময় এসেছে। 'প্রবাস বন্ধু' শারদীয়া সংখ্যায় এবার অনেক উৎসাহী লেখক-লেখিকার সাড়া পেয়েছি। তাঁদের সকলের এবং আমার সহযোগীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।

আমাদের এই সংখ্যার প্রচ্ছদ চিত্রটির শিল্পী শ্রীমতী সংযুক্তা দত্ত। সংযুক্তা আমাদের শহরবাসী শ্রীমতী শ্রবণা নাথ বিশ্বাসের দিদি। এই ভাগিনীদ্বয়ের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ রইল।

প্রবাস বন্ধুর পক্ষ থেকে সকলকে শারদীয়া শুভেচ্ছা জানাই।

মালবিকা চ্যাটার্জী

শিল্পী : নমিতা রায়চৌধুরী

‘একলা চলো’ - মন্ত্রসিদ্ধ বিদ্যাসাগর

সুমিতা বসু

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯০৫ সালে লিখেছিলেন, ‘যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে’, পরে গানটি স্বদেশ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং গানটির গভীর অর্থের জন্য দেশে কালে এটি বিশেষভাবে জনপ্রিয় হয় | গানটির সুর আমাদের চিরপরিচিত কীর্তনের ঢঙে, ‘হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে আমার একলা নিতাই’, অন্তর্নিহিত অর্থটি ব্যঞ্জনাময় | কবিগুরুর এই গানটির সঙ্গে গান্ধীজীর প্রতিকৃতি যুক্ত হলেও, গানটি শুনলেই সাদা ধুতি-চাদর পরিহিত খর্বাকৃতি এক ছবি আমার চোখের সামনে মুহূর্তে ভেসে ওঠে - বিদ্যাসাগর|

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বিদ্যাসাগর) সময়কাল কিন্তু এই গানটি রচনার অনেক আগে - জন্ম সেপ্টেম্বর ২৬, ১৮২০ আর প্রয়াণ জুলাই ২৯, ১৮৯১ | বিদ্যাসাগরকে বাংলার নবজাগরণের প্রাণপুরুষ বললেও অত্যুক্তি হয় না, ‘একলা চলার’ মন্ত্রে তিনি ছিলেন দীক্ষিত|

ঈশ্বরচন্দ্রের বাবার নাম ঠাকুরদাস ও মা ভগবতী দেবী | জন্ম ঘাটালে, তদানীন্তন কলকাতা থেকে দূরে, আর মনে রাখতে হবে, কলকাতাও তখন নবজাগরণের পীঠস্থান হয়ে ওঠেনি | রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, বিধাতা কী করে চল্লিশ লক্ষ বাঙালি তৈরীর মাঝখানে একটা মানুষ তৈরী করে ফেললেন!

বিদ্যাসাগর নিজে বলেছিলেন, “বিধবা বিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম |” এর নাকি শুরু হয়েছিল এক ব্যক্তিগত ঘটনায় - একটি ছোট মেয়ে, কাছে আসছে না, কিছু খাচ্ছেও না, শুকনো মুখ | স্বভাবতঃই কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারলেন, মেয়েটি বিধবা এবং সেইদিন একাদশী, তাই খাচ্ছে না| সেই থেকে শুরু, কেন মেয়েরা ধর্মের দোহাই দিয়ে এই প্রথার বলি হবে? তখন রামমোহন রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমে সবেমাত্র সতীদাহ-প্রথা বন্ধ হয়েছে, তাই সমাজে বালিকা বিধবাদের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান এবং তাদের ঘিরে আরো নতুন নতুন সমস্যাও | আবার একে কেন্দ্র করে সংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু সমাজ আরো অনেক নিয়ম-নির্দেশাবলী প্রস্তুত করতে সদা ব্যস্ত|

এই সময়ে বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক ভাবনা ও কাজগুলো প্রথাগত হিন্দু সমাজের কাছে অশ্রুতপূর্ব ও প্রবলভাবে আপত্তিকর হবে, এ আর নতুন কথা কি? তাই বিরোধীপক্ষ তাঁর সব কাজেই খুঁত ধরতে দূরবীন নিয়ে তৈরী হয়ে উঠেছিলেন | ইদানীংকালে আনন্দবাজার পত্রিকায়, শঙ্খ ঘোষ বিদ্যাসাগর সম্পর্কিত একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, “খুব বড় রকম কোনো কাজ, যেটাতে অনেক বড় রকম স্বপ্ন থাকে, সেটা একাই করতে হয়| এইজন্য করতে হয় যে, প্রথমে সেটা কেউ বিশ্বাসই করে না| যদি বা বিশ্বাস করল, ভাবতে থাকে, এত বড় জিনিস ঘটিয়ে তোলা যাবে না| কেউ কি পারছে? ...নিশ্চয়ই কোনো গোলমাল আছে | সেই গোলমালের সন্ধানটাই তখন বড় হয়ে ওঠে|” এক কথায়, যে কোনো বড় কাজে, আবার ওই ‘একলা চলা’র মন্ত্র|

প্রসঙ্গতঃ, বিদ্যাসাগরকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য একটু আলোচনা করতে চাই | ‘বিদ্যাসাগরচরিত’ প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, “বিদ্যাসাগরের জীবনবৃত্তান্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে এই কথাটি বারম্বার মনে উদয় হয় যে, তিনি যে বাঙালি বড়লোক ছিলেন তাহা নহে, তিনি যে রীতিমত হিন্দু ছিলেন তাহাও নহে - তিনি তাহা অপেক্ষাও অনেক বেশী বড় ছিলেন, তিনি যথার্থ মানুষ ছিলেন | বিদ্যাসাগরের জীবনীতে এই অনন্যসুলভ মনুষ্যত্বের প্রাচুর্যই সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় | তাঁহার সেই পর্বতপ্রমাণ চরিত্রমাহাত্ম্যে তাঁহারই কৃত কীর্তিকেও খর্ব করিয়া রাখিয়াছে |... বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুটিত করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব করিয়াছেন তাহা

বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল |... যাঁহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের পরিমাণ অধিক, চিরাগত প্রথা ও অভ্যাসের জড় আচ্ছাদনে তাঁহাদের সেই প্রবল শক্তিকে চাপা দিয়া রাখিতে পারে না |" তাঁর সঙ্গে একমাত্র রাজা রামমোহন রায়েরই সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় | রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গতঃ বলেছেন, "একদিকে যেমন তাঁহারা ভারতবর্ষীয়, তেমনি অপর দিকে য়ুরোপীয় প্রকৃতির সহিত তাঁহাদের চরিত্রের বিস্তর নিকটসাদৃশ্য দেখিতে পাই | অথচ তাহা অনুকরণগত সাদৃশ্য নহে | বেশভূষায় আচারে ব্যবহারে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাঙালি ছিলেন; স্বজাতীয় শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমতুল্য কেহ ছিল না; স্বজাতিকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের মূলপত্তন তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন; অথচ নির্ভীক বলিষ্ঠতা, সত্যচারিতা, লোকহিতৈষা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা এবং আত্মনির্ভরতায় তাঁহারা বিশেষ-রূপে য়ুরোপীয় মহাজনদের সহিত তুলনীয় ছিলেন |"

বিদ্যাসাগরের প্রতিভা ও কীর্তি বহুমুখী | বঙ্গভাষাকে তিনি মাতৃত্বের যত্নে লালন পালন করেছেন | তাঁর হাতেই বাংলা অন্ত্য-মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে পা রাখল, বাংলাভাষার সুললিত শব্দ, বর্ণ, গতি, ছন্দ আবার লয় ও যতিও তাঁরই অবদান | প্রজন্মের পর প্রজন্ম তাঁরই লেখা 'বর্ণপরিচয়' পড়ে ভাষাশিক্ষা লাভ করেছে ও করছে | সাহিত্য, ভাষা, স্ত্রীশিক্ষা, সমাজসংস্কার সবদিকে তীব্রদৃষ্টি ও নিরলস কর্মযজ্ঞ, এ তো গেল কীর্তি ও প্রতিভার দিক | আসলে বিদ্যাসাগরের সব থেকে বড় পরিচয় তিনি এক বিশাল মাপের মানুষ, তাই সকলকে মানুষ হিসেবে সম্মান করাই ছিল তাঁর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য | রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "প্রতিভা মানুষের সমস্তটা নহে, তাহা মানুষের একাংশমাত্র | প্রতিভা মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের মতো; আর, মনুষ্যত্ব চরিত্রের দিবালোক, তাহা সর্বত্রব্যাপী ও স্থির |"

মাতৃভাষার প্রতি বিদ্যাসাগরের গভীর ভালবাসা ও আনুগত্য বিতর্কের অবকাশ রাখে না, কিন্তু আজ দু'শ বছর পরে দাঁড়িয়ে আর অতীতের আয়নায় চোখ রেখে, হঠাৎ করে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালে কি আমরা 'বাংলাভাষা' সম্পর্কিত কোনো সদুত্তর দিতে পারব? বাংলাভাষীরা আজ অনেকেই মাতৃভাষা-ভোলার নেশায় মত্ত, শিকড় আমাদের টানে না বরং মেকী সাহেবীভাষা ও পোশাকেই নাকি আমরা সর্বাঙ্গসুন্দর! নীলবর্ণ শৃগালের বংশোদ্ভুত হয়ে আমাদের মুখ যতই ঢেকে যাক বিজ্ঞাপনে, যতই আপন ঐতিহ্যকে অস্বীকার করি না কেন, এতে যে এক সুগভীর আত্মবমাননা আছে, তা এড়াই কী করে? রবীন্দ্রনাথ এক প্রত্যয় ও বিশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, "যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্য সম্পদে ঐশ্বর্যশালিনী হইয়া উঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয়ভাবজননীরূপে মানব সভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়, যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরব লাভ করিতে পারিবে |"

বিদ্যাসাগরের জন্মের দ্বিশত ও কীর্তির সার্ধশত বছর পরে, পেরেছি কি আমরা সেই জায়গায় পৌঁছাতে? 'সুবোধ আর রাখাল' চরিত্রের রচয়িতা চেয়েছিলেন, বাংলায় কিছু দুর্দান্ত ছেলের জন্ম হোক, বিদ্যাভ্যাসে তারা সুবোধ হলেও, চরিত্রগঠনে তারা যেন নির্ভীক হয় - হ'ল কি? আবার আসি রবীন্দ্রনাথের কথায়, "নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই | এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালি জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে | সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভাল চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায় | বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন |"

১৮৫০ সালে বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের সাহিত্য অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন, ও ১৮৫১ সালে উক্ত কলেজে প্রিন্সিপাল পদ অধিকার করেন | পদমর্যাদা কিন্তু তাঁর কাছে অনাবশ্যক ছিল এবং বারম্বার ওপরওয়ালার সঙ্গে মতবিরোধ হলেই তিনি কাজে ইস্তফা দিতে পিছপা হননি | বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অপরিসীম - শুরু হয়েছিল তখনকার ব্রিটিশ আমলের শিক্ষাসচিব বেথুন সাহেবের সহায়তায়, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার উদ্যোগে | সালটা ছিল ১৮৪৯ | ক্রমশ সেই শিক্ষার আগ্রহই তাঁকে সমাজ সংস্কারের পথে টেনে আনল | বাল্যবিধবাদের দুঃখে ব্যথিত হয়ে, তারপর হিন্দু শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ করে, ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহকে (Hindu Widows' Remarriage Act) রাজবিধিসম্মত আইন করে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করা - সবই বিদ্যাসাগর দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে সুসম্পন্ন করেছিলেন | বাধা ছিল বিস্তর, কিন্তু তাতে তাঁকে বাঁধতে পারেনি

কেউ | ডিরোজিও শিষ্য রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে এই ঐতিহাসিক প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানটি হয়েছিল | কথিত আছে গোঁড়া হিন্দুসমাজ এতে প্রবল আপত্তি করে | কলকাতায় সেদিন দারুণ টালমাটাল, উত্তেজনা | ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাটি ছিল এর প্রবল বিরোধী, কিন্তু 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' বিদ্যাসাগরকে সম্মান ও সমর্থন করে অনেক খবর বার করেছিল | সেই থেকেই জানা যায়, বেশ কিছু বরেণ্য মহোদয় সেই বিবাহে উপস্থিত ছিলেন, যেমন রামগোপাল ঘোষ, দিগম্বর মিত্র প্রমুখ |

বিদ্যাসাগরের নির্ভীক চরিত্রের এক পরিচয় পাই 'হিতবাদী' পত্রিকার এক লেখা থেকে, 'বিদ্যাসাগর পথে বাহির হইলে চারিদিক হইতে লোক আসিয়া তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিত, কেহ পরিহাস করিত, কেহ গালি দিত | কেহ কেহ তাঁহাকে প্রহার করিবার এমনকি মারিয়া ফেলিবারও ভয় দেখাইত | ...কলিকাতায় কোন বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে মারিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছেন | দুর্বৃত্তেরা প্রভুর আজ্ঞা পালনের অবসর প্রতীক্ষা করিতেছে | ...বিদ্যাসাগর একেবারে সেখানে গিয়া উপনীত হইলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত্র সকলেই অপ্রস্তুত ও নির্বাক হইয়া পড়িলেন | কিয়ৎক্ষণ গত হইলে একজন পারিষদ বিদ্যাসাগরের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন | বিদ্যাসাগর উত্তর করিলেন, "লোকপরাম্পরায় শুনিলাম আমাকে মারিবার জন্য আপনাদের নিযুক্ত লোকেরা আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া আমার সন্ধানে ফিরিতেছে ও খুঁজিতেছে | তাই আমি ভাবিলাম তাহাদিগকে কষ্ট দিবার আবশ্যক কি, আমি নিজেই যাই | এখন আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন | ইহা অপেক্ষা উত্তম অবসর আর পাইবেন না |" লজ্জায় সকলে মস্তক অবনত করিলেন |'

শুধু কি নারীশিক্ষা, স্কুল প্রতিষ্ঠা, বিধবা-বিবাহ, বাংলা ভাষা গদ্যের পরিমার্জনা, যতি চিহ্নের ব্যবহার? সংস্কৃত কলেজে তখন অব্রাহ্মণের প্রবেশাধিকার ছিল না, বিদ্যাসাগরের ভূমিকা সেখানেও - প্রতিবাদে ও সমাধানে | শিক্ষার ক্ষেত্রে সবার অধিকারের পুরোধা তিনি | এরপর তিনি সংস্কৃত কলেজ ছেড়ে দেন ও মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন | "বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম", বলেছেন রবীন্দ্রনাথ | বিদ্যাসাগর নিজে ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত, আধুনিক বাংলা গদ্যের জনক, কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি বাংলার পাশাপাশি পরাধীন দেশের নাগরিক হয়ে কীভাবে রাজতন্ত্রের মোকাবিলাও করতে হয়, এবং তার নিদর্শন স্বরূপ ইংরেজি ভাষার প্রসার ও শিক্ষাও যে আবশ্যক, তাঁর ভাবনায় ছিল | তাই কবিগুরুর ভাষায়, "আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল | যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন, যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন, এবং সংস্কৃত বিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না তিনিই ইংরাজি বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন |"

তাঁর দান-দয়া সর্বজনবিদিত | রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত | কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করিতে পারে এমন আর কিছুই নহে | কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালিসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায় |"

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও তাঁর প্রতিভার সঙ্গে আমাদের কোনো পরিচয়ই থাকত না যদি বিদ্যাসাগর সদা সর্বদা তাঁর পাশে না থাকতেন | শুধু মধুসূদন নন, আরো অনেককে বিদ্যাসাগর যে ধার করেও দান করেছেন, এ উদাহরণ ঝুড়ি ঝুড়ি পাওয়া যায় | সকলে বিপক্ষ আর একলা পথ চলা, ওই 'একলা চলা'র মন্ত্র তাঁর জীবনের বাঁকে বাঁকে | আসলে যুগে যুগে কোনো বড় কাজ করতে গেলে একলাই চলতে হয় পথ, নির্জন গহন সে পথে নিঃসঙ্গতাই একমাত্র দোসর |

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন | এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি-সোদর কেহ ছিল না | এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন | তিনি সুখী ছিলেন না | তিনি নিজের মধ্যে যে এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই | তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই | তিনি প্রতিদিন দেখিয়াছেন - আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি তাহা পালন করি না;

ভূরিপরিমাণ বাক্যরচনা করিতে পারি, তিলপরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস্, এবং নিজের বাক্-চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য | এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল | কারণ, তিনি সর্ব বিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন|"

এই ক্ষণজন্মা মানুষটি সম্বন্ধে প্রাজ্ঞজন আজও বলেন -

"বিদ্যাসাগর এমন একজন মানুষ যিনি প্রাচীন ঋষির মতো জ্ঞানী ও প্রতিভাবান, ইংরেজের মতো কর্মোৎসাহী আর যাঁর হৃদয় বাঙালি মায়ের মতো", শঙ্খ ঘোষের ভাষায়|

বিধবা বিবাহের কথাই ধরা যাক না কেন, তথাকথিত কলকাতা হিন্দু সমাজে ধিক্কার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ - কি? ওই খর্বাকৃতি, মুন্ডিত-মস্তক, খড়ম-পরা দু'চার পাতা সংস্কৃত জানা পন্ডিত, এক হতদরিদ্র ব্রাহ্মণ, সে নাকি দেবে বিধবা বিবাহ? ছিঃ ছিঃ! ঈশ্বর গুপ্তের অশ্রাব্য সমালোচনা পত্রিকাতে, আর মুখোমুখি কোমর বেঁধে নামলেন তৎকালীন কেষ্টবিষ্টু মহারথীরা, সঙ্গে স্বয়ং শোভাবাজারের রাজা রাধাকান্ত দেব | বিতর্ক জমে উঠল, শতাধিক ন্যায়-নীতি-জ্ঞানসম্পন্ন পন্ডিত, স্বভাবতই হার হ'ল বিদ্যাসাগরের | জিতলেন বিদ্যারত্ন, খাস নবদ্বীপের পন্ডিত, যে সে কথা! হার হলেও হার মানবেন না বিদ্যাসাগর | এবার শুরু হ'ল স্বাক্ষর সংগ্রহ | বিদ্যাসাগর পেলেন হাজারেরও কম, কিন্তু অন্য দলের সংগ্রহে ৩৬,৭৬৩| এবারও নতি স্বীকার করলেন না বিদ্যাসাগর; নতি স্বীকার করা কি যায়, যখন সামনে এক মহাব্রত? সারা পৃথিবী জুড়ে, যুগে যুগে এইভাবেই সমাজ এগিয়ে চলেছে সংখ্যালঘুদেরই দ্বারা | এখানেও রক্তমাখা চরণতল দলে দলে সেই 'একলা চলা'র ব্রত|

একবার শ্রীরামকৃষ্ণদেব এসেছিলেন বিদ্যাসাগরকে দেখতে, বলেছিলেন, "অনেক নদী নালা দেখেছি, আজ সাগর দেখে ধন্য হলাম|"

প্রত্যুত্তরে বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, "তবে তো সাগরের নোনা জলই নিতে হবে আপনাকে|"

স্বভাবসিদ্ধ হেসে ঠাকুর বলেছিলেন, "বাপু, এ যে জ্ঞানের সাগর, অমৃতময়|"

এই দু'শ বছর ধরে বাংলাকে, বাংলাভাষাকে, বাঙালিকে তিনি দুহাত ভরে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন | বেঁচে আছেন আমাদের স্বপ্নে, কাজে, আদর্শে | ব্যস্ত ফুটপাথে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পথের আলোয় পড়তে বা এমনকি যুগোপযোগী মোবাইল নিয়ে খেলতে দেখে, দেখি আর এক আগামী বিদ্যাসাগরকে, আর আমাদের বিদ্যাসাগরের বুকটা গর্বে

ফুলে ওঠে | অপ্রাপ্তবয়স্ক নাবালিকার বিয়ে বন্ধ হলে, শুনতে পাই তাঁর খড়মের আওয়াজ, নিশ্চিন্ত শান্তি | রিকশাওয়ালার ছেলে মেয়ে কলেজে ভর্তি হলে, বিদ্যাসাগর আসেন বৃষ্টি হয়ে আশীর্বাদ করতে|

আবার চার বছরের মেয়েটি ধর্ষণের শিকার হলে বুকের সাদা চাদরটা থমথমে কালো মেঘের মতো ভারাক্রান্ত, কখনো গর্জে ওঠে বজ্র বিদ্যুতে | ছেলেকে পড়িয়ে যখন বাবার পকেট নাকি খালি - মেয়েকে পড়াতে বিদ্যাসাগর নিজে আসেন তাঁর দানের থলি হাতে, তবু কি শুনতে পায় এরা?

এক নেতা নাকি সেদিন বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মালা দিতে গিয়ে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন, তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরাও অবাক | আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছে খুব, মাঠ ঘাট পরিষ্কার, মূর্তিও | শুধু মূর্তির দু-চোখের কোণায় স্পষ্ট দু-ফোঁটা জল টলমল করছে | তবে কি অঝোর ধারাপাতে একলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, সারারাত তিনি কেঁদেছেন!

এইসব ভাবতে ভাবতে রাস্তা পেরিয়ে এলাম, হঠাৎ চোখে পড়ল এক ভিখারিণী রাস্তা থেকে এক ফেলে-দেওয়া কাপ আর স্ট্র কুড়িয়ে নিয়ে কোথা থেকে একটু সাবান জল জোগাড় করে এনে সাবানের বুদ্বুদ ওড়াতে লাগল হাওয়ায়। দুটি ছোট

ছেলে ছুটে ছুটে ধরতে লাগল ওই বুদ্বুদ, সাবানের না স্বপ্নের?

দূর থেকে হলেও মনে হ'ল, রাস্তার ওপারে বিদ্যাসাগরের মূর্তির ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি।

শিল্পী : নমিতা রায়চৌধুরী

শ্রদ্ধার্ঘ্য:

সহজ ভাষার কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

"**কি** শীত কি শীত দাদা
কি শীত কি শীত
দিবস যদি বা কাটে
কাটে না নিশীথ
নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে কাঁথা কম্বলে
উঁকি মেরে দেখি যায় বছরটা চলে।"

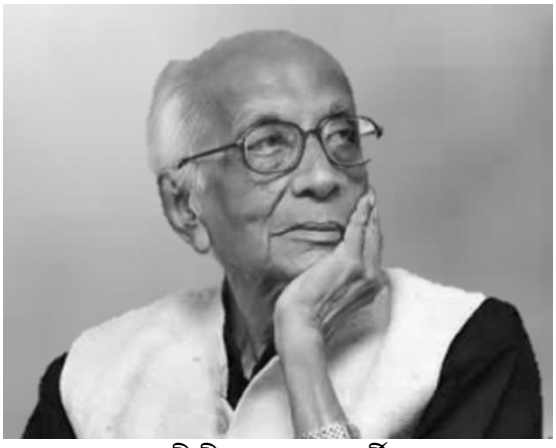

শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এখানে সহজ ছন্দে বছর ঘুরছে। পুরনো বছর শেষ হচ্ছে। নতুন বছর আসছে। কোথাও কোনো তাল কাটার ব্যাপার নেই। এ খেলা চলেছে, চলেইছে। যে মানুষটি এই সহজ অথচ গভীর সত্যটা মাত্র ছয়টি লাইনে অবলীলায় আঁকতে পারতেন তিনি কোথায়? "ডাকো ওকে ডাকো / ওই যে লোকটা পার হয়ে যায় কাঁসাই নদীর সাঁকো।"

কিন্তু দেরী হয়ে গেছে যে। ডাকলেই কি আর ফিরে আসতে পারবে সেই মানুষটা? কাঁথা কম্বলের পাহাড় থেকে উঁকি মেরে দেখি ২০১৮ বছরটির সঙ্গে সঙ্গে কাঁসাই নদীর সাঁকো পার হয়ে অনেক দূরে চলে গেলেন "সহজ ভাষার কবি" নীরেন্দ্রনাথ। শুধু কবি নীরেন্দ্রনাথ বললে তাঁর পরিচয় একেবারেই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শ্রী নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন একাধারে কবি, প্রাবন্ধিক, ছড়াকার, গোয়েন্দা গল্পের লেখক, শিশু সাহিত্যিক, সম্পাদক ও বাংলা ভাষার নীতি নির্ধারক। এইরকম একজন সাহিত্য ব্যক্তিত্ব নিয়ে লিখতে গেলে প্রথমেই দ্বন্দ্বের মুখোমুখি হতে হয়। তাঁর

কাজের কোন দিকটি নিয়ে লিখব? কোনো নির্দিষ্ট একটি দিক নিয়ে বিশদে লিখব নাকি বিভিন্ন দিক বুড়িছোঁয়া করব? আমি নীরেন্দ্রনাথের লেখার পাঠক মাত্র, কোনো সাহিত্য সমালোচক নই | তাই তাঁর সাহিত্য সাধনার যেসব ফসল আমাকে পাঠক হিসেবে ঋদ্ধ করেছে সেইরকম কিছু দিক তুলে ধরতে চেষ্টা করছি | এই লেখা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে পাঠক আমির ব্যক্তিগত ভ্রমণের স্মৃতিচারণ|

আমি তখন তৃতীয় বা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি | খুব মনে পড়ে মাসে দুটো দিন বাড়ীর বাঁধা কাগজওয়ালার সাইকেলের ঘন্টির আওয়াজ শোনার জন্য কান খাড়া করে রাখতাম | জানালা দিয়ে ঝপাৎ করে 'আনন্দবাজার পত্রিকা' কাগজের সঙ্গে আরো একটা বই মেঝেতে পড়ত ওই দুদিন | পাক্ষিক 'আনন্দমেলা' | ১৯৫১ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় তিনি তাঁর কর্ম-জীবন শুরু করেন|

পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা চল্লিশ বা পঞ্চাশের কোঠায় বয়স যেসব বাঙালির, যাঁরা পশ্চিমবঙ্গে বড় হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে খুব কম মানুষ আছেন যাঁদের শৈশবে বা কৈশোরে আনন্দমেলার কোনও ভূমিকা নেই | দেখতাম, পত্রিকাটি খুললেই তৃতীয় পাতায় সূচীপত্রের পাশে লেখা সম্পাদকের নাম, - নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | দীর্ঘ সময় তিনি 'আনন্দমেলা' পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন | পত্রিকার বিষয় নির্বাচনে ও আঙ্গিকের পরিকল্পনায় সম্পাদকের ভূমিকা সম্বন্ধে তখন কোনো ধারণা ছিল না আমার | কিন্তু আনন্দমেলা আর নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী একটা অভিন্ন সত্তা বলে মনে হত | আর সেভাবেই নিজের অজান্তে নামটি খোদাই করা হয়ে গেছে মাথায় | এ নাম আমার আশৈশবের চেনা | আনন্দমেলার হাত ধরে পেয়েছি সমরেশ বসুর 'গোগোল', বিমল করের 'কিকিরা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সন্তু আর কাকাবাবু' | আরো আছে - টিনটিনের বাংলা অনুবাদ, তরুণ মজুমদারের চিত্রনাট্যে আর বিমল দাশের ছবিতে অনবদ্য শরদিন্দুর লেখা 'সদাশিবের অভিযান'-এর গল্প, শীর্ষেন্দুর 'অদ্ভুতুড়ে' সিরিজ | সত্যি কথা বলতে কি, আনন্দমেলা পড়তে পড়তেই কিশোর মনের বাংলা সাহিত্যে মজে যাওয়া | শিশু-কিশোরদের পত্রিকার ইতিহাসের আদিপর্বে সেগুলি ছিল পরিবারভিত্তিক | 'আনন্দমেলা' তার ব্যতিক্রম | সম্পাদক নীরেন্দ্রনাথের গভীর ভাবনা ও নিরলস সাধনায় আনন্দমেলা আমার মতো আরো বহু মধ্যবিত্ত বাঙালি শিশু ও কিশোর মনের পাঠ চাহিদাই যে শুধু পূরণ করেছিল তা নয়, সাহিত্যের এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছিল তাদের সামনে|

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মনে করতেন, "কঠিন ভাষা যারা বলে, শোনে ও বোঝে, সহজ ভাষা বলে শোনে ও বোঝে তার চতুর্গুণ মানুষ | আর তাই আমার কবিতা যদি অনেক লোকের কাছে পৌঁছে দিতে হয় তো ভাষার স্তর নির্বাচনে কোনও ভুল করলে আমার চলবে না, সহজ বাংলার জনপথ ধরেই আমাকে হাঁটতে হবে|"

তাঁর ছড়া বা কবিতায় তাই সহজ বাংলার উদযাপন|

"বৈশাখে তো বেজায় গরম / প্রাণ করে ধড়ফড়
তার ভিতরেই দমকা ওঠে কালবোশেখীর ঝড়|
জ্যৈষ্ঠ মাসে চাই না খেতে কেউই অন্য কিছু
চাই শুধু আমি কাঁঠাল এবং বারুইপুরের লিচু|" ('সালতামামি')

ছন্দের জাদুতে বাংলা অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন শিশুমাত্রই এই ছড়াটি শুনে রসাস্বাদন করতে পারবে | একজন কবি বা সাহিত্যিক হিসেবে নীরেন্দ্রনাথ শুধু সাহিত্য রচনাই করেননি | বাংলা ভাষার পাঠক তৈরীর দিকেও তাঁর সজাগ দৃষ্টি ছিল | শুধু ছড়াতে নয়; একইরকম সহজ উচ্চারণ দেখি তাঁর অনেক কবিতাতেও |

"এই গলিতে সদ্য একটা ফ্ল্যাটবাড়ি উঠেছে|
প্রতিটি তলায়
আগুপিছু চারটি করে ফ্ল্যাট| তাতে দুটি
বেডরুমের সঙ্গে একটি ছোট
বারান্দা ও রান্নাঘর| তার পাশে লাগোয়া
কলঘর, এবং কায়দা করে
ওই যাকে লিভিং কম ডাইনিং সবাই
বলে থাকে|" ('সাকুল্যে তিনজন')

নগর সভ্যতার এক বিরাট সংকট - জায়গার অভাব | খোলামেলাভাবে বাঁচার সুযোগের অভাব, যা মানুষের ভাবনা চিন্তাকেও ক্রমশই করে তুলছে সংকীর্ণ| সহজ কয়েকটি শব্দে ফুটে উঠেছে সেই সমস্যার ছবি|

তাঁর প্রবন্ধ বা গল্পেও এর ব্যতিক্রম নেই|

"রাত বারোটা| খিলআঁটা ঘরের মধ্যে অন্য কোনো আলো নেই| শুধু একটা জিরো পাওয়ারের নীল বাল্ব জ্বলছে, আর সেই বাল্বের দিকে চোখ রেখে একেবারে চুপ করে আমি বসে আছি | এমন সময় সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল|"

'জাল ভেজাল' গল্পের এই পর্যন্ত পড়ে সামনে যে এসে দাঁড়াল তার চেহারাটা দেখার জন্য পাঠক চোখ তুলে না চেয়ে পারবেন কি? লেখার সহজ শৈলীর গুণে গল্প পড়ছি এ কথা ভুলে যেতে হয়। গল্প আর বাস্তবের ভেদরেখা মুছে যায়। একজন গল্পকারের এর থেকে বড় সার্থকতা আর কী হতে পারে?

বাংলাভাষা নিয়ে তাঁর বিশেষ ভাবনা চিন্তার ফসল আনন্দমেলার পাতায় বার হতে থাকা কলাম "বাংলা বলো"। এ কাজে তিনি সামিল করেছিলেন কবি শঙ্খ ঘোষ আর ভাষাবিদ পবিত্র সরকারকে। ভাষাটির ছন্দ আর ব্যাকরণ নিয়ে সহজ আর সাবলীল ভঙ্গীতে তিনি নিজে নিয়মিতভাবে লিখতেন "কবিতার ক্লাস"। এসব ভাবনা চিন্তা এক জায়গায় করে পরে প্রকাশিত হয় তাঁর বই "বাংলা কি লিখবেন কেন লিখবেন"। বাংলা ভাষার পরিশিলীত একটা রূপ নির্মাণের চেষ্টায় এ বইয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বিশ শতকের নবম বর্ষে তাঁর জন্ম, আবার সেই একই শতকের সমাপ্তি-লগ্নে তাঁর প্রয়াণ। অরুণ মিত্র দীর্ঘজীবী পুরুষ, কিঞ্চিৎ অধিক নব্বই বছর তাঁর আয়ুষ্কাল। অর্থাৎ একটা পুরো শতাব্দীর যা ঘটনাবলি, বলতে গেলে তার প্রায় সবই তিনি চোখের সামনে দেখেছেন। শুধুই দেখেছেন বললে অবশ্য কিছুই বলা হয় না। যা দেখেছেন, তার প্রভাব পড়েছে তাঁর জীবনে, তাঁর ভাবনায়। সেটা সকলের ক্ষেত্রেই পড়ে। তবে তিনি সংবেদনশীল কবি ; তাই প্রভাবটা আর পাঁচজনের তুলনায়, তাঁর ভাবনায় একটু বেশি পরিমাণেই পড়ে থাকবে। সেটাই স্বাভাবিক। ২০০৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত প্রবন্ধ অরুণ মিত্রের কবিতা: "পর্ব থেকে পর্বান্তর"-এ নীরেন্দ্রনাথের বলা এই কথাগুলি যে তাঁর নিজের সম্বন্ধেও সত্যি হয়ে যাবে তা কে জানত?

"একদিন সমস্ত যোদ্ধা
বিষণ্ন হবার মন্ত্র শিখে যাবে।
একদিন বৃদ্ধ দুঃখহীন বলতে পারবে যাই।
একদিন সমস্ত রক্ত আর ঘাম অর্থ পাবে অন্য রকমের।
একদিন সমস্ত শিল্পী কল্পনায় প্রতিমা বানাবে।
একদিন সমস্ত নারী চোখের ইঙ্গিতে বলবে এসো।
একদিন সমস্ত ধর্মযাজকের উর্দি কেড়ে নিয়ে
নিষ্পাপ বালক বলবে, হাহা।
একদিন এইসব হবে বলেই
সূর্য ওঠে, বৃষ্টি পড়ে, এবং কবিতা লেখা হয়।"

আশার উজ্জ্বল এই উচ্চারণ আবহমান আলোর দিশারী হয়ে রয়ে গেল।

নীরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৯২৪ সালের ১৯শে অক্টোবর, অবিভক্ত ভারতের ফরিদপুরে। ১৯৩০ সালে কলকাতায় চলে আসেন। আর প্রয়াণ ২০১৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর। তাঁর চুরানব্বই বছরের শরীরটি রোদ্দুর হয়ে গেল ঠিকই কিন্তু থেকে গেল অনেকটা আলো আর উষ্ণতা পরবর্তী প্রজন্মের লেখক, পাঠক ও বাংলাভাষার যে কোন অনুরাগীদের জন্য।

তাঁর প্রথম কবিতার বই "নীল নির্জন" ১৯৫৪ সালে প্রকাশ পায়।
১৯৭৪ সালে তিনি "সাহিত্য অ্যাকাডেমি" পুরস্কারে ভূষিত হন।

শিল্পী : নমিতা রায়চৌধুরী

টেক্সাসে রবীন্দ্রনাথ

মৃণাল চৌধুরী

এত বছর হিউস্টনে আছি, কিন্তু জানতাম না যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৯ সালে হিউস্টন এবং টেক্সাসের বেশ কয়েকটি শহরে লেকচার ট্যুরে এসেছিলেন | উদ্দেশ্য ছিল শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা |

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোট তেত্রিশটি দেশ পরিক্রমা করেছিলেন, যা সেসময়ে এক অভাবনীয় ঘটনা | আমার অন্ততঃ জানা নেই যে সেই আমলে কোন কবি বা সাহিত্যিক এতগুলো দেশ পরিক্রমা করেছিলেন কিনা | নিয়মিতভাবে ট্র্যান্স অ্যাটলান্টিকের ওপর বিমান চলাচল শুরু হয় ১৯৩৯ সাল থেকে | তাই রবীন্দ্রনাথের এতগুলো পরিক্রমা সবটাই জাহাজে বা স্থলপথেই ছিল | সে আমলে তেত্রিশটি দেশ পরিক্রমা ছিল যথেষ্ট পরিশ্রমসাধ্য, যা কিনা নোবেল পুরস্কারের থেকে কিছু কম নয় |

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নিভৃতে ঈশ্বরচিন্তা ও ধর্মালোচনার উদ্দেশ্যে বোলপুর শহরের উত্তরাংশে এই শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন | ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন | ক্রমশ সেই বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয় | ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর, (১৩২৮ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ) রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বিশ্বভারতীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এখানে | এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বপ্ন পূরণ করবার জন্যই তিনি নিজের দেশের বিভিন্ন জায়গায় এবং বিদেশে ভ্রমণ করে, নানা জায়গায় বক্তৃতা দিয়ে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করেন | আমেরিকায় আসবার সেটিও এক বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল তাঁর |

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঁচবার আমেরিকায় এসেছিলেন - ১৯১২-১৩, ১৯১৬-১৭, ১৯২০-২১, ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে | মোট সতেরো মাস - নিজের দেশ এবং ইংল্যান্ড ছাড়া আমেরিকাতেই সবচেয়ে বেশি সময় তিনি কাটিয়েছিলেন | রবীন্দ্রনাথ এই সতেরো মাস আমেরিকায় সময় কাটাবার অভিজ্ঞতায় নানা কাগজে, নিবন্ধে, আলোচনায়, পত্রিকায়, বক্তৃতায় যেমন আমেরিকার সুখ্যাতি করেছিলেন তেমন সমালোচনাও করেছিলেন যথেষ্ট | নিয়ে গিয়েছিলেন নানা রকম ধ্যান-ধারণা আর চিন্তা-ভাবনা যা সতত প্রয়োগ হয়েছে ওঁর কাজে আর লেখায় | আর তৈরি হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন |

এই পাঁচবারের মধ্যে একবার (১৯২০-২১) এসেছিলেন টেক্সাসে | ৯ই ফেব্রুয়ারী শিকাগো থেকে ট্রেনে করে রওয়ানা দিয়ে ওকলাহোমা হয়ে ডালাসে পৌঁছেছিলেন ১২ই ফেব্রুয়ারী | ডালাসে উনি Alophus নামে একটি হোটেলে ছিলেন | হোটেল থেকে বরফ-ঢাকা মাঠের ওপর সূর্যোদয় দেখে অভিভূত হয়েছিলেন | সেদিনের Matheon ক্লাব আয়োজিত সভাটি হয়েছিল Scottish Rite Cathedral-এ | রবীন্দ্রনাথ পড়েছিলেন ওঁর লেখা "The Meeting of the East and West" এবং নিজের লেখা কিছু কবিতা |

ডালাসের পর ১৩ই ফেব্রুয়ারীতে আসেন হিউস্টনে | Rice University-র সাপ্তাহিক কাগজ "The Thresher"-এ ১৯২১ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যার থেকে রবীন্দ্রনাথের হিউস্টন পরিক্রমার বিষয়ে জানা যায় | এই খবরের কাগজটি Rice University-র ছাত্রদের দ্বারা প্রকাশিত কাগজ যা আজও প্রচলিত আছে | সেই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে এবং শান্তিনিকেতন স্কুলের সম্বন্ধে বিস্তারিত লেখা হয়; এবং সেই কাগজেই শান্তিনিকেতনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনার উল্লেখ আছে |

রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি আয়োজিত হয়েছিল হিউস্টনের সিটি অডিটোরিয়ামে ১৩ই ফেব্রুয়ারী, ১৯২১ সালে বেলা ৩টেয় | ওঁর বক্তৃতার আয়োজন করে Theosophical Society of Houston | সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল উন্মুক্ত মন নিয়ে পৃথিবীর সব ধর্ম সম্বন্ধে জানা ও সব ধর্মের সমন্বয় করা | Annie Besant ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট | এই প্রতিষ্ঠানটি আজও সক্রিয় |

Rice University-র শিক্ষক এবং ছাত্ররা নিমন্ত্রিত হয়ে ভাষণ শুনতে আসেন ঠিকই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষণটি Theosophical সোসাইটির সৌজন্যে সকলের উদ্দেশ্যেই ছিল | জানা যায় প্রায় সাত হাজার লোক সমবেত হয়েছিল | ওই সোসাইটিই সেই আয়োজনের সবরকম অর্থনৈতিক দায়িত্বভার বহন করেছিল |

"The Thresher" কাগজে ১৯২১ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের হিউস্টনে ভাষণের সংবাদটি সংযোজন করা হ'ল |

THE THRESHER

VOLUME VI — RICE INSTITUTE, HOUSTON, TEXAS, FEBRUARY 11, 1921 — NUMBER 20

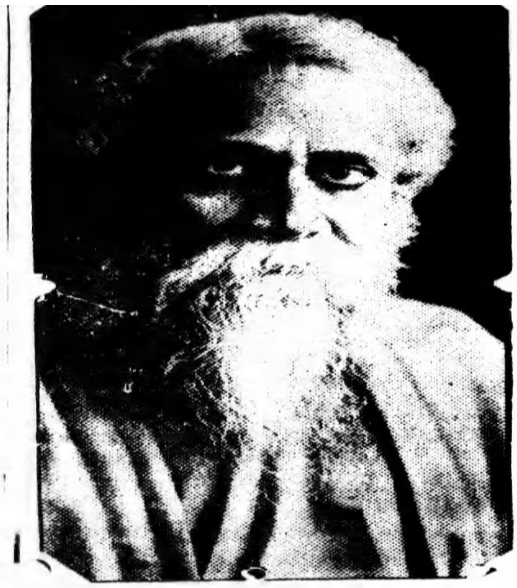

RABINDRANATH TAGORE SPEAKS HERE FEB. 13TH

Considered Genius of Age, at Auditorium Sunday.

By Mrs. Laura Wood.

The fact that Tagore will appear in Houston at the City Auditorium, Sunday afternoon, February 13, at 3 o'clock, has awakened much interest in the great man, in his race and nationality, in his writings and his public work.

Rabindranath Tagore was born in Calcutta, India, in 1861. His father, himself a great spiritual leader, was the son of a maharaja in a family distinguished throughout India for many centuries. He is an Aryan of Aryans, not a drop of blood of the yellow or brown races flows in his veins. It is sometimes necessary to remind the American that the Hindu is just as much of a white man as he is. The Hindu, though an earlier sub-race, is purely Aryan, showing pure Aryan features of the most clear-cut and refined type, the burnette complexion being the result of many centuries of life in the tropics.

life in the tropics.

The great versatility of Tagore's genius makes him an outstanding figure in the world today. He has reached heights of excellence in every department of literature—poetry, drama, essays, short stories and novels. He has to his credit over 100 volumes, showing creative genius and great originality. He is remarkable in that he combines in himself the traits of the East and the West in a super-degree. He is a contemplative philosopher, a mystic poet, and yet he is a man who can do things, an organizer who can make his dreams come true. He has demonstrated his practical ability in his success as an educator, a social and political reformer, and lecturer.

Principal Works.

Since receiving the Nobel prize for idealistic literature in 1913, Tagore has gained an unprecedented international reputation as a poet and a man of letters, causing a great demand for his works in English translation. His best known works are: "Gitanjali," (Song Offerings), "Sadhana, the Realization of Life," "Sacrifice," "The Postoffice," "The Gardener," "Stray Birds," "Fruit Gathering," "The Hungry Stones," "Chitra," and "The King of the Dark Chamber."

Tagore's Ideal School.

In 1902 Tagore founded an open-air school on his estate, Shanti-Niketan (Abode of Peace); there were only three or four children, his own young son being among the first students. There are now over 200 students and more than 20 teachers.

"I decided to found a school," said Tagore, "where the students could feel that there was a higher and a nobler thing in life than practical efficiency . . . It was to know life itself well."

In pursuance of this ideal, a small number of pupils (not over eight or ten) live with a teacher in a small house on the estate. Corporal punishment, harsh words, and fault-finding are not allowed; teachers and students are like friends, or like older and younger brothers. Love is the great force used to make the children good and happy, and under the love and guidance of Tagore and his teach-

(Continued on Page 4, Column 3.)

Rabindranath Tagore.

(Continued From Page 1, Column 6.)

ers the boys are prepared for the university in two years less time than by the British-Indian government schools.

The Day's Program.

The students and the teachers get up with the morning bell at 4:30. They make their own beds and all come out singing songs and chanting hymns in praise of the Lord of the Universe. After bathing they put on their white silk robes and sit down for individual prayer and meditation. Then they partake of a light breakfast.

School begins at 7:30. Each student brings his individual piece of mat, spreads it under the trees, and classes begin without books amid sunshine, odor of flowers, and the rustle of leaves.

At 10:30, after three hours' intensive study, the classes disperse. They bathe and rest, and the second meal is served at 11:30. Boiled rice, vegetable dishes, pure butter and milk from the school dairy make up the meal. The use of meat, wine and improper language are forbidden.

At two the classes assemble again under the trees. The school closes at four. The boys then take a light lunch and rush to the playgrounds; they excell in football, cricket, hockey, and tennis, having defeated many Calcutti college teams in these games.

Games over, the boys bathe and put on their white silk robes and spend about 30 minutes in prayer and meditation. After the evening meal classes in music assemble and are often taught by Tagore himself. The astronomical classes go out star-gazing, and the dramatic clubs rehearse plays written by Tagore .

At night the boys also edit their newspapers, of which there are four in the school. They are all written and illustrated by hand. One of the best papers is conducted by children between six and ten. Tagore buys many books on all subjects, which he asks his pupils to read and then decide for themselves.

One must admit that this is a busy day's program, as in addition the boys cook their own food and wash their own clothes.

The system of education is planned to develop imagination and the faculty of observation. Boys are made to observe a single insect or a single flower from birth to death, and Tagore publishes these interesting observations in his own magazine.

The teachers are saturated with patriotic fervor; they are wide-awake and in touch with the world movements, for Tagore is more than an Indian nationalist, he is a representative of world-wide humanity.

Tagore is making his second transcontinental lecture tour in America. He comes, as before, to raise, by means of lectures, money to maintain his boys' school and to establish a university in connection with it. He has given his private funds for the past 20 years, the royalty from his books, and his Nobel prize for the support of the schools.

Admission to the Tagore lecture in Houston at the City Auditorium, on Sunday afternoon, February 13, at 3 o'clock has been made free to all through the courtesy of the Theosophical Society, in assuming all financial responsibility, and through the generosity of private subscribers, who are aiding them in bringing the culture of this great man directly to the people.

The faculty and students of Rice Institute are invited to attend his lecture.

হিউস্টনের পর রবীন্দ্রনাথ ১৪ই থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত টেক্সাসের অন্যান্য শহরেও যান, এবং সেখানেও ভাষণ দেন | ১৪ই ফেব্রুয়ারী Waco-তে, ১৫ই Fort Worth, ১৬ই Denton, ১৭ই Georgetown , ১৮ই Shreveport এবং ২০শে আবার ডালাসে | ডালাসে উনি দুবার First Unitarian Church-এ ভাষণ দেন | ডালাসের ইতিহাসে সেটা ছিল এক ঐতিহাসিক ঘটনা | ক্রিম রঙের পোশাকে দীর্ঘদেহী, সুপুরুষ রবীন্দ্রনাথ ওঁর আচরণে এবং ভাষণে এক হাজার দর্শকমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন | একবার সকালে এবং আরেকবার বিকেলে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়, যা ডালাসের First Unitarian Church-এর ইতিহাসে বিরল |

First Unitarian Church একটি উদার, গভীর আনন্দময়, নীতিসম্পন্ন ধর্মসংস্থান | ডালাসে এই সংস্থার প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৯৯ সালে, এবং আজও তা সেভাবেই প্রতিষ্ঠিত | ভালবাসা, মানসিক উন্নতি, আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি এবং সবরকম ভাল দেখা ও প্রচার করা, মুক্ত মন নিয়ে সবকিছু বিচার করাই এই সংস্থার মূল উদ্দেশ্য | হিউস্টন এবং অন্যান্য অনেক শহরেই এই চার্চের শাখা আছে | রবীন্দ্রনাথের চেহারা, কথাবার্তা, আচরণ, তাঁর বিশ্বচেতনা চার্চের সভ্যদের এতই মোহিত করেছিল যে সকালের অনুষ্ঠান পুনরায় বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় |

First Unitarian Church of Dallas তাদের এই উদারনীতির ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকাকে নিম্নলিখিতভাবে চিহ্নিত করে -

"In an event unprecedented in the history of Dallas, Rabindranath Tagore, Nobel Prize recipient in literature, poet and philosopher from India spoke at the church in 1921. In his long cream-colored robe and sandals, he gave Dallas, by his presence, a glimpse of a larger world of faith than had been previously experienced. One thousand people heard him at the morning and evening services, with the newspaper reporting over six hundred others turned away. Years later, in the early 1990s, the Minister of Religious Education, Rev. Norma Veridan, along with leaders at Thanksgiving Square would establish the Multi-Faith Explorations and Exchange program, which would provide opportunities for participants from around the city to visit each other's churches and learn about their faith and practices, continuing to foster inter-faith understanding and wisdom begun so many years before."

{আমার এই লেখার বিষয়ে উৎসাহ পেয়েছি টেগোর সোসাইটির বর্তমান প্রেসিডেন্ট দেবলীনা ব্যানার্জীর কাছ থেকে | গভীর ও অক্লান্ত আগ্রহের সঙ্গে Google আর Internet ঘাঁটাঘাঁটি করে দেবলীনা সংগ্রহ করেছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব পরিভ্রমণ সম্পর্কে নানাবিধ সংবাদ ও তথ্য | তার মধ্যে একটি হচ্ছে "The Thresher" পত্রিকা, যা সাপ্তাহিক খবরের কাগজ হিসাবে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হত, এবং আজও হয় Rice University-র ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে | সেই কাগজে ১৯২১ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের হিউস্টন পরিক্রমার বিষয়ে সংবাদ পরিবেশিত হয় | সেই সংবাদপত্রের অংশটি এখানে সংযোজন করেছি |

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে চাই যে প্রকাশিত কাগজটি এতই পুরনো যে সব অংশ পাঠযোগ্য ছিল না | "প্রবাস বন্ধু" পত্রিকার সম্পাদিকা মালবিকা চ্যাটার্জীর সাহায্যে এটি পাঠযোগ্য করা সম্ভবপর হয় |

মালবিকা এবং দেবলীনার সহযোগিতার জন্য আমি তাদের অশেষ ধন্যবাদ জানাই |}

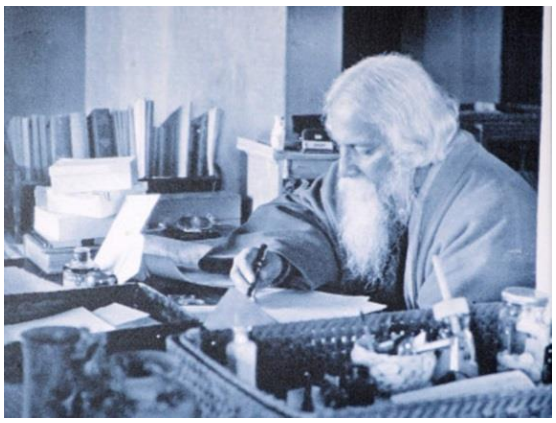

বিশ্বের দুঃসাহসী

অসিত কুমার সেন

জীবনের কর্মব্যস্ততার দিনগুলির দিকে জীবন সায়াহ্নে দৃষ্টিপাত করবার অবসর যখন হ'ল, তখন দেখি তার স্মৃতি সবটাই যে স্পষ্ট, তা নয় | তবু কত স্মৃতি মনে দাগ কেটে দিয়েছে, তারা ভাল-মন্দে মিলে উজ্জ্বল তারার মতো মনে জেগে আছে | কিন্তু জীবনের শেষ অধ্যায়ে আজ যে দৃশ্য দেখে চমক লাগল, সেই দৃশ্যের তুলনা কী দিয়ে করি? কথাটা খুলে বলার চেষ্টা করি |

আজ প্রায় চার দশক আগেকার কথা | এই দেশের কিছু সংখ্যক বিশ্বহিতৈষী বৈজ্ঞানিকদের একটি সংস্থার সংস্পর্শে এসেছিলাম | তাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক তথ্যের ভিত্তিতে জগতের রাষ্ট্রনায়ক থেকে জনসাধারণকে সেদিন সতর্ক করেছিলেন যে জলে স্থলে পৃথিবীর তাপমাত্রা এত দ্রুত বেড়ে উঠছে যে নিকট ভবিষ্যতে প্রকৃতির এক বিধ্বংসী মূর্তি আমরা আমাদের জীবদ্দশায় দেখতে পাব | সেই প্রলয় যখন শুরু হবে ততদিনে তাকে বশে আনবার ক্ষমতা আমরা হারিয়ে ফেলব | সুতরাং অবিলম্বে তাপমাত্রা কমাবার কাজ শুরু করার প্রয়োজন আছে | পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ও তার ঊর্ধ্বে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি অদৃশ্য গ্যাস আমরা ক্রমাগত বাড়িয়ে তুলছি আমাদের জীবিকা উপার্জনের সহায়ক কলকারখানা, গাড়ি, প্লেন, যাবতীয় যান্ত্রিক বস্তুর ব্যবহারের ইন্ধন পেট্রোল, ডিজেল তেল ও কয়লা পোড়াতে | ভূগর্ভস্থ ইন্ধনগুলির ব্যবহার অবিলম্বে কমাবার ব্যবস্থা করা বিশ্বের সব দেশের কর্তব্য | বিভিন্ন উপায়ে ইন্ধনের বিকল্প ব্যবস্থা শুরু করা আবশ্যক | সেই উদ্যোগে তারা বৈদ্যুতিক তাপ বা শক্তির উৎপাদনে সূর্যের, বায়ুর এবং সমুদ্রের জলশক্তির ভূমিকা উল্লেখ করেছিলেন | অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি (global warming) রোধ করতে চালু ইন্ধনগুলির ব্যবহার কমাবার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন |

তারপর প্রায় ৪০ বছরে কত আন্তর্জাতিক মন্ত্রণাসভা, রাষ্ট্রসংঘের কত সিদ্ধান্ত, ঘোষণা শেষ হয়েছে | কিন্তু যে বিপদ কোনও জাতি বা রাষ্ট্রের একলার বিপদ নয়, সমগ্র পৃথিবীর সর্বব্যাপী বিপদ, সে ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রনায়করা কোন সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা গঠনে আজ পর্যন্ত সমর্থ হননি | কী কারণে প্রায় ২০০টি রাষ্ট্রের অধিনায়করা তাদের সংঘবদ্ধ কাজের মাধ্যমে এখনও কোন কার্যকরী প্রতিরোধক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে অক্ষম হয়েছেন?

দুটি কারণ প্রথমেই দৃষ্টিগোচর হয় | প্রথমতঃ, আবহবিজ্ঞানে যে পন্থায় বিপদের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে সেই কম্পিউটারের কার্যপ্রণালী, পরিসংখ্যান ও তার সংশ্লিষ্ট কর্মধারার নিয়ম ও ব্যাখ্যার জটিল কাজ সচরাচর পরিস্ফুট হয় না | ফলে আবহবিজ্ঞানের তথ্য ও মূল্যায়নে তারা আবহবিজ্ঞানী ছাড়াও ফলিত পদার্থবিদ ও রাসায়নিক প্রমুখ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মুখাপেক্ষী | সর্বসাধারণের পক্ষে সে পথ কঠিন | সুতরাং তারা পৃথিবীর এই বিপদের কথা সঠিক ধারণা করতে পারে না | রাষ্ট্রনায়ক ও আর্থিক সংস্থারা ক্ষমতাশীল, কিন্তু তাঁরা এ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের বিশেষ আমল দেননি | বাকি রইল জনসংযোগ ও প্রচারের কাজে টেলিভিশন ও ইন্টারনেট, তাদের জগতে পলিটিক্যাল ও সামাজিক তথ্য পরিবেশন করা অনেক বেশি লাভজনক কাজ | দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক জগতে খনিজ পেট্রোলিয়াম, গ্যাস এবং কয়লার এমন বিপুল নিয়োগ বিরাজ করছে, তাদের মালিকানাসত্ত্ব এত দৃঢ়মূল ও সুদূরপ্রসারী, যে রাষ্ট্র শাসনে তাদের ক্ষমতা খর্ব করা এক দুরূহ কাজ | আর্থিক জগতে স্বভাবতই অদৃশ্য বিপদের আশঙ্কায় কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা আনতে কম মানুষই উদ্যোগী | অথচ এই খনিজ ইন্ধনগুলিই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে দূষিত করে চলেছে | Industrial Revolution-এর সময় থেকে বিশ্বের তাপমাত্রা গড়ে এক থেকে দুই সেলসিয়াস ডিগ্রী বাড়লেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা | সুতরাং বিপদের প্রতিকার ও তাপবৃদ্ধির মাত্রা রোধ করবার উপায় বৈজ্ঞানিক মহলে জানা থাকলেও সে বিষয়ে কাজ বিশেষ এগোয়নি | ইতিমধ্যে পৃথিবীর নানা জায়গায় বিপদের স্বরূপ প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে | উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর, গ্রীনল্যান্ডের বরফপুঞ্জ পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে বায়ুপ্রবাহ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করে | সেসব স্থায়ী বরফপুঞ্জে ফাটল ধরেছে, উত্তরমেরু, গ্রীনল্যান্ড ও দক্ষিণমেরুর বরফপুঞ্জের বিশাল খন্ড একাধিক স্থানে ভেঙে পড়েছে | সেই বরফ সমুদ্রের উষ্ণতর জলে মিশে সমুদ্রের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি করছে | এজন্য কেবল যে ফিজি, মালদ্বীপের মতো দ্বীপ-রাষ্ট্রগুলি বিপন্ন হয়েছে, তা নয় | সমুদ্রে জলবৃদ্ধির জন্য লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, মায়ামির মতো ঘন বসতি শহরগুলোতেও জল প্রবেশের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে | বায়ুপ্রবাহে অনেক বেশি এবং শক্তিশালী হারিকেন পৃথিবীর বহু

স্থানে প্রচুর ক্ষতি করছে | অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব বেড়ে চলেছে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় | রাষ্ট্রনায়করা প্রধানতঃ ,জগতের বা একক রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতির দোহাই দিয়ে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও মিথেন জাতীয় গ্যাসের পরিমাণ হ্রাস করতে নারাজ |
সম্প্রতি একটি ঘটনা তাদের এই নিষ্ক্রিয়তার প্রতি আলোকপাত করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে | সেই প্রসঙ্গই আমার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য |

ইউরোপে সুইডেন একটি ছোট দেশ হলেও তার শিক্ষার মান উন্নত | সেই দেশের ১৬ বছর বয়সের একটি কিশোরী, Greta Thunberg মাত্র আট বছর বয়সে গ্লোবাল ওয়ার্মিং সমস্যার পরিচয় পায় | গত বছর থেকে সে প্রতি শুক্রবার স্কুলে যাবার বদলে স্টকহোল্মে দেশের জাতীয় বিধানসভা ভবনের সামনে হাতে-লেখা একটি প্ল্যাকার্ড নিয়ে এই সমস্যাটির

বিষয়ে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার প্রতি তার বিক্ষোভ প্রকাশ করে এসেছে | বিধানসভার প্রতি তার দাবী গ্লোবাল ওয়ার্মিং রোধ করার জন্য | Greta-র এই প্রতিবাদ ইউরোপের অন্যান্য দেশে, যেমন - অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স-এর যুব সমাজেও প্রতিধ্বনি জাগিয়েছে | অতঃপর, নিউ ইয়র্কে ২০১৯-এর বিশ্বরাষ্ট্র সংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে Greta-কে তার বক্তব্য প্রকাশ করার আমন্ত্রণ জানানো হয় | প্রথমে সে রাজি হয়নি, কিন্তু এই সভায় তার বক্তব্য বহু শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে, সেই যুক্তিতে সে রাজি হয় |

এদিকে অ্যাটল্যান্টিক মহাসাগর সে প্লেনে বা জাহাজে পার হবে না, কারণ তাতে পেট্রোল ও ডিজেল বাতাসের দূষণ আরও বাড়িয়ে দেবে | শেষ পর্যন্ত একজন নৌ-ক্যাপ্টেন ইংল্যান্ডের প্লিমথ বন্দর থেকে ৬০ ফুট লম্বা এক সৌরশক্তিচালিত জাহাজে প্রচুর বিপদের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও Greta-কে দুই সপ্তাহে সাগর পার করে নিউ ইয়র্ক বন্দরে পৌঁছে দেন |
সেদিন নিউ ইয়র্ক শহরে তাকে সম্বর্ধনা জানিয়েছিল বিরাট জনসমাবেশ ও বেশ কয়েকটি পালতোলা জাহাজ - Greta-র সৎ সাহসের উপযুক্ত সমর্থন!

এদেশে পৌঁছে সে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিবাদ করতে আহ্বান জানিয়েছে | তার ডাকে সাড়া দিয়েছে ১০০০-এর বেশি স্কুল | গত ২০শে সেপ্টেম্বর ছিল বিশ্ব-যুব-সম্মেলনের সেই প্রতিবাদ দিবস | সেদিন নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস, বার্লিন, মেলবোর্ন, সিডনি থেকে শুরু করে নাইরোবি, রিও ডি জেনারো, মুম্বাই পর্যন্ত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে তাদের প্রতিবাদ জানিয়েছে রাজনীতিবিদদের নিষ্ক্রিয়তার উদ্দেশ্যে | এটি জগতের ইতিহাসে কিশোর-কিশোরীদের বৃহত্তম ঐক্যবদ্ধতার নিদর্শন |

এর পরে প্রতিবাদের মূল বক্তব্য বিশ্ব পরিষদে UN Climate Action Summit-এ রাজ্যের প্রতিনিধিদের সামনে ব্যক্ত করেছে Greta | বিশ্বের দরবারে তার প্রতিবাদ অন্যায়ের বিরুদ্ধে | তার জ্বলন্ত ভাষায় প্রতিবাদ –
“This is all wrong. I shouldn’t be here. I should be back in school on the other side of the ocean.”
কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক লোকে বলে থাকে পৃথিবীর ভবিষ্যতের আশা ছোটরাই | একথা কতদূর অসত্যের পরিচয় দেয়! সেই কারণে Greta-র প্রতিবাদ – “How dare you! You have stolen my dreams and my childhood with your empty words.”
তোমাদের অকর্মণ্যতার জন্য পৃথিবী আজ বিপন্ন |

"And yet I am one of the lucky ones, people are suffering. People are dying. Entire eco-systems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction. And all you can talk about is money and your fairy tales of eternal economic growth. How dare you!"

কী স্পর্ধা তোমাদের!

পৃথিবীর সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সামনে একটি ষোড়শীর মুখের এই ভাষা সাধারণ ক্ষেত্রে হয়তো উপযুক্ত নয়। কিন্তু পৃথিবীর এক অভূতপূর্ব বিপদের সময় তার প্রতিকারের সচেষ্টতা যেখানে দেখা যায় না, সেক্ষেত্রে Greta-র কঠোর ভাষায় জগতের চৈতন্য জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা কি সমর্থন করা যায় না? প্রায় পাঁচ দশকের ঔদাসীন্যের দরুণ প্রাকৃতিক জগতে যে বিপদ ঘনিয়ে এসেছে, মানব সভ্যতার বিপর্যয়ের সম্ভাবনা যে ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, সে ক্ষেত্রে এক কিশোরীর মুখের ভাষা সঙ্গত কিনা আমরা কি কেবল সেই বিচারই করব!

আমরা এক রাষ্ট্রের নাগরিক, সেই সঙ্গে পৃথিবীরও অধিবাসী | যেটুকু ক্ষমতা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে, সেই ক্ষমতায় পৃথিবীর এই দারুণ সমস্যার উপশমে ব্যবহার করতে কি পারি না? কয়লা ও পেট্রোলজাত তাপে চালিত সবরকম যন্ত্রের ব্যবহার কমাবার চেষ্টা করা কি একেবারেই অসম্ভব?

আজ বিশ্বের যুবসমাজ তাদের ঘোর বিপদগ্রস্ত ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত করে যদি তাদের কাজে সক্রিয় অসহযোগিতার পথে নামে, সারা বিশ্বে পারিবারিক অশান্তির আশঙ্কায় শুধু নয়, কল্যাণের পথে তাদের কাজ, তাদের নিষ্ঠা আমরা উপেক্ষা করব কোন স্বার্থের দোহাই দিয়ে?

প্রকৃতি, ব্যক্তি ও সমাজমানস

শেলী শাহাবুদ্দিন

বাংলার নিসর্গ মঞ্চে ঝড় বৃষ্টির আগে প্রকৃতির আয়োজক যে বিস্তারিত নাট্য পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, কোনও অবাঙালিকে তা বোঝানো যাবে না|

মেঘের চিত্রকলা আর আলোক নিয়ন্ত্রণ, বাতাসের কোরিওগ্রাফি আর গাছে গাছে নৃত্য সঞ্চালন, গায়ে কাঁটা দেওয়া বিদ্যুতের প্রক্ষেপন, আর মন্দ্র মেঘনাদের সাথে বৃষ্টির আত্মহারা খেয়াল যখন মন্দ্র সপ্তক থেকে তার সপ্তকে কখনও বিলম্বিত, আর কখনও দ্রুত লয়ে পরিবেশিত হয়, তখন মনে হয়, পৃথিবীর সকল সঙ্গীতগুরুর গুরুমহাশয় এই আয়োজনের স্রষ্টা | স্বর্গ সত্যই আমার কাম্য, যদি সেখানেও এমন সঙ্গীত পরিবেশিত হয়|

দেশ থেকে যেদিন আমেরিকায় ফিরে আসি সেদিন এখানেও বৃষ্টি হচ্ছে | কী নিদারুণ দরিদ্র এই বৃষ্টি | বাংলার রাজকীয় আয়োজনের কিছুই এদেশে নেই | যেন কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থা | রক্ষণশীল বড়লোকের দেশ; বোধহয় আমেরিকায় বৃষ্টির আয়োজকদের মনোজগতেও রক্ষণশীলতার সেই দারিদ্র ও নিষ্ঠুরতা বাসা বেঁধেছে|

নৈসর্গিক এইসব বিভিন্ন ও বিচিত্র পরিবেশ ও রূপের সাথে আমাদের কী সম্পর্ক?

আমার বিশ্বাস এই যে, মানুষ তার জিনপঙক্তির সংকেত ও তার পরিবেশের প্রভাবের যোগফল| পরিবেশের একাংশ প্রকৃতি, অন্য অংশ মানুষ | মানুষ অংশে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী, বন্ধু-বান্ধব, কর্মজীবনের সকল মানুষ, এবং আরো কিছু দূরবর্তী মানুষ, যাদের মধ্যে মহাপুরুষ থেকে শুরু করে চোর-ডাকাতও থাকতে পারে| অর্থাৎ ব্যক্তির মানুষ-পরিবেশ প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন হতে বাধ্য| মানুষের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি ও অভিজ্ঞতার ব্যাপক অংশ আসে এই মানুষ-পরিবেশ থেকে| পরিবেশের এইসব মানুষের মাধ্যমে গড়ে ওঠে ব্যক্তিমানস | অবশ্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি ব্যক্তিমানসের সাথে সাথে সমাজমানসকেও প্রভাবিত করে | কিন্তু ব্যক্তির প্রভেদের কারণে মানুষ-পরিবেশ ও সমাজমানসের ভেতরে বিভেদ ও সংকটের সৃষ্টি হয়|

প্রকৃতি সমাজমানস নিয়ন্ত্রণ করে সমভাবে | যে ভূখণ্ডে মানুষ লালিত হয়, সেই ভূখণ্ডের মাটি, জল আর নিসর্গের আচরণ প্রভাবিত করে সেই ভূখণ্ডের সকল মানুষের মন | শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ও রাজনীতি মানুষ নিজেই নিয়ন্ত্রণ করে | কিন্তু নিসর্গকে ব্যাপকভাবে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করে না | পরিবর্তে প্রকৃতি মানুষের মনন প্রভাবিত করে | অর্থাৎ মানুষের পরিবেশের মধ্যে প্রকৃতি একমাত্র অংশ যা ব্যক্তির মনন এবং সমাজমানসকে নিরপেক্ষভাবে প্রভাবিত করে |

বাংলার প্রকৃতিতে আছে অকৃপণ উদারতা | দীর্ঘ বর্ষায় দৃশ্যমান হয় প্রকৃতির ভরাট যৌবন | আবার ঝড়-বৃষ্টি-বন্যার উদ্দামতায় প্রকাশিত হয় প্রকৃতির অনবদমিত আবেগ | হয়তো তারই ফলে বাঙালি আবেগপ্রবণ, উচ্ছ্বাসপ্রবণ জাতি | গ্রামের মানুষের আতিথেয়তায় প্রতিফিলত হয় প্রকৃতির উদারতার প্রভাব | দীর্ঘ বর্ষার মতো সংবেদনশীল, সহানুভূতিশীল, সরস ও সমৃদ্ধ মানুষের মন | মরুবাসী মানুষের রুক্ষ চরিত্রের ঠিক বিপরীত | আবার ঐতিহাসিকভাবে বাঙালির শান্তিপ্রিয় যুদ্ধবিমুখ স্বভাবকে যদি চারিত্রিক দৃঢ়তা বা প্রতিযোগিতা-প্রিয়তার অভাব মনে করা হয়, তাহলে তার মধ্যেও প্রকৃতির প্রভাব দৃশ্যমান | বাংলার বনে-জঙ্গলে সব ধরনের গাছপালা মিলেমিশে জড়াজড়ি করে বড় হয় | একমাত্র কালবৈশাখীর ঝড়ের তান্ডব ছাড়া বাংলার প্রকৃতি সর্বত্র মানুষের মনে শান্তির প্রলেপের মতো কাজ করে | যুদ্ধংদেহী আগন্তুককে বাংলার নিসর্গ যেন বলে, 'শান্ত হও, শান্ত হও' |

আজ থেকে সাতাত্তর বছর আগে (১৯৪২) কবি ও শিক্ষাবিদ হুমায়ুন কবির লিখেছেন, "বাংলার আকাশে নিদাঘ রৌদ্রের নিষ্ঠুর দীপ্তি, আষাঢ়ের ঘন বর্ষার মেঘসম্ভারের মধ্যে ঐশ্বর্য ও মহিমা, এবং শ্রাবণের দিবারাত্র অবিরাম বর্ষণধারার সঙ্গীতে হৃদয়াবেগের প্রতিচ্ছবি | ষড়ঋতুর বিচিত্র নৃত্যলীলা যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন যে বাঙালি কবিমানসের উৎস কোথায় | শরতের নীলাকাশে কূলে কূলে জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ে, কাশের শ্বেত হাসিতে নদীকূল ভরে ওঠে, হেমন্তের পরিপূর্ণ প্রশান্তির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্বের নিরসন মেলে | শীতার্ত কুহেলী রাত্রির অবগুণ্ঠিত মায়াজালে নিদ্রিত ধরণীর যে জড়িমা, মানুষের আশা ও নিরাশার অঙ্কুর তারই মধ্যে প্রথম প্রকাশিত, বসন্তের বাতাসে নতুন উন্মাদনার সঙ্গে নবীন জীবনের সঞ্চার তারই মধ্যে নিহিত | ছয়টি ঋতুর এ বিচিত্র খেলা | প্রকৃতির চঞ্চল পরিবর্তনশীল সৌন্দর্যের সে ঐশ্বর্য যে বাঙালির মনকে কাব্য জগতে আকর্ষণ করেছে, তাতে বিচিত্র কী?"(১)

ফলে, শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন যে জীবনের কোন না কোন সময় কবিতা লেখেনি | পারুক না পারুক, পৃথিবীর সব মানুষের মনে যেমন গান গাওয়ার ইচ্ছা জাগে, বাঙালির তেমনি কাব্যমানস | বাংলার প্রকৃতি যেন অক্ষম বাঙালির প্রাণেও মাঝে মাঝে জোর করে কাব্যচিন্তার পাগলামি ঢুকিয়ে দেয় | এই কাব্যমানসই বাঙালিকে করেছে যুদ্ধবিমুখ | দেয়ালে পিঠ ঠেকে না যাওয়া পর্যন্ত তাই বাঙালি পড়ে পড়ে মার খায় |

বাঙালির এই আপাত নিষ্ক্রিয়তার মূলে হয়তো বাংলার নদীর নিরন্তর ভাঙা গড়াও এক কারণ | "নদীর একূল ভাঙে, ওকূল গড়ে, এইতো নদীর খেলা" এই গান তো বাংলার মাটি থেকে উৎসারিত বাঙালির জীবনদর্শন | আবহমান বাংলার মানুষ দেখে এসেছে যে নদীর এই ভাঙা-গড়ার একসময় কোন প্রতিকার ছিল না | তাই তাকে মেনে না নিয়ে উপায় কি? কিন্তু তাই বলে উপকূলবাসী মানুষ বা চরের মানুষেরা হাল ছেড়ে দিতে জানে না | তারা একূল ভাঙলে আবার ওকূলে গিয়ে জীবন গড়ে তোলে | তারা হেরে যায় যখন ক্ষমতাশালীরা তার সেই জমিটা কেড়ে নেয় | আবার অন্যদিকে হুমায়ুন কবির বাঙালির কাব্যমানসে যে আত্মস্বতন্ত্র বিদ্রোহী মনের কথা উল্লেখ করেছেন, তা হয়তো বাঙালির মননে কালবৈশাখীর ভয়ঙ্কর সুন্দরের অপ্রতিহত প্রভাব (১)|

আসলে আমরা মানুষরা তো এই প্রকৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ | সভ্যতার দাপটে আমাদের কৃত্রিম বেশবাস, বৈভবের মোহজাল, আর যান্ত্রিক জীবন সেকথা ভুলিয়ে দেয় | বিজ্ঞানের আশীর্বাদে আমরা ভাবি আমরা প্রভু | প্রকৃতিকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করি | কিন্তু সত্যিই কি তাই? সেই শৈশবে, পরিণত হওয়ার অনেক আগে, বৃষ্টির জলে গাছের পাতার আন্দোলন দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে |' সেদিন ওই শিশুমনে যে কবিমানস জন্মগ্রহণ করে, নিঃসন্দেহে সেদিনের প্রকৃতি ও পরিবেশ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল |

আমেরিকা এক বিশাল দেশ | তার ভেতরে এক রাজ্য থেকে আর এক রাজ্যে গেলে দেখা যায় প্রকৃতির বৈচিত্র আর ঐশ্বর্য | কিন্তু এ এক ধরণের নিয়ন্ত্রিত বৈচিত্র | অ্যাটলান্টায় দেখেছি শহরে আর শহরের বাইরে মাইলের পর মাইল শুধু

পাইন গাছ | ছোট ছোট পাহাড় পর্বতের মধ্যে অগণিত পাইন গাছ, প্রথম দেখায় ভাল লাগে | কিন্তু দেখতে দেখতে একসময় একঘেয়ে হয়ে যায় | অধিকাংশ রাজ্যে দেখা যায় এই একঘেয়েমির ঐশ্বর্য | হয়তো সেজন্যই আমেরিকার অধিকাংশ মানুষ একঘেয়েভাবে সম্পদের পেছনে ছোটে | এদেশেও বহু প্রতিভাবান শিল্পী সাহিত্যিক আছেন | জ্ঞান-বিজ্ঞানে এঁরাই অগ্রণী | কিন্তু সাধারণ মানুষ প্রকৃতির রূপ-রস নিয়ে মাথা ঘামায় না | আমাদের দেশের মতো রাজনীতি ও বাইরের পৃথিবী নিয়ে এদের কোন আগ্রহ নেই | অধিকাংশ সাধারণ আমেরিকান পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানে না | কিন্তু এরা এক অসম সাহসী জাতি | মনে হয়, অপরাধের শাস্তি হিসাবে নির্বাসিত হয়ে এবং দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার জন্য এরা যখন অভিবাসী হয়ে এদেশে আসে, তখনকার কঠিন জীবন তাদের সাহসী হতে বাধ্য করেছে | একদিকে তাদের লড়াই করতে হয়েছে লড়াকু নেটিভ ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে, অন্যদিকে লড়তে হয়েছে বিশাল অজানা ভূখণ্ডের অনিয়ন্ত্রিত বিরূপ প্রকৃতির সাথে |

আমেরিকার পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে এক বিশাল মরু অঞ্চল, যা ঠিক আরব দেশের মরুভূমির মতো নয় | বিচিত্র সব ক্যাকটাস সমৃদ্ধ এই ভূখণ্ডকে রুক্ষভূমি বললেই বেশি মানায় | আবার উত্তরে রয়েছে তীব্র শীতের অঞ্চল | উত্তরে এবং পশ্চিমে যারা সে সময় কঠোর প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বসতি গড়ে তোলে, তাদের বলা হয় পাইওনিয়ার | এই পাইওনিয়ার ও কাউবয়দের বীরত্বের গল্প নিয়ে লেখা হয়েছে বহু কাহিনী (২)| হলিউড তাদের নিয়ে যে অজস্র ছবি করেছে, তা শুধু আমেরিকার সমাজমানসই নয়, সারা পৃথিবীর মানুষকেই কোন না কোনভাবে সেসব ছবি প্রভাবিত করেছে |

মোট কথা এদেশে হেমন্তের পাতা ঝরার আগে গাছে গাছে যে বর্ণিল সৌন্দর্য, তা ছাড়া এদেশের প্রকৃতির মধ্যে বাংলার প্রকৃতির মতো কোন অকৃপণ উচ্ছ্বাস দেখা যায় না | আর হেমন্তের রঙিন পাতা যে পাতাঝরার অব্যবহিত আগে মৃত্যুর পরোয়ানা, সেই কারণেই বোধহয়, প্রকৃতির এই ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস মানুষের মন সেভাবে উচ্ছ্বসিত করে না |

প্রকৃতির কারণে মানুষের মধ্যে যে লড়াকু মনোভাব প্রবল হতে পারে তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ সম্ভবত আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের সীমান্ত প্রদেশের মানুষ | ভিন্ন শক্তির আধিপত্য এরা কোনদিন মেনে নেয়নি, এবং পৃথিবীর বড় বড় পরাশক্তি এদের নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়েছে | এই দুই অঞ্চলেই নিরস দুর্গম পার্বত্য জীবন এদের চরিত্র গঠন করে |

তেমনি মরুভূমির দেশগুলিতে প্রকৃতি যেমন রূপ-রস-বর্ণহীন, মানুষের আচরণে তেমনি মাধুর্যহীন রুক্ষতা | তার মানে এই নয় যে সেখানে ভাল মানুষ নেই | কিন্তু একজন আরব যখন শুভসকাল জানায়, তখন তার অভিব্যক্তি আর গর্জন একজন নতুন মানুষের মনে ভীতির উদ্রেক করে | বৈচিত্রহীন প্রকৃতি, মানুষের আচরণও তাই | দুজন মানুষ দেখা হলে শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য তারা দশ থেকে পনের মিনিট একই কথা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলবে | মরুবাসীদের পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যদ্রব্য, ঘর-বাড়ি, সবই সংক্ষিপ্ত, বৈচিত্রহীন | এখন সম্পদ ও নগরায়নের ফলে বড় বড় শহরে যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে, তার গতিও অকিঞ্চিৎকর (৩)|

আমেরিকার প্রকৃতি সমৃদ্ধ ও পৌনঃপুনিক | এদেশের মানুষও তাই | আমেরিকার মানুষ প্রকৃতি নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় না | তার একটি বিশেষ কারণও আছে | এদেশে বাড়িঘর এমনভাবে বানানো হয় যে প্রকৃতি থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে হয় | বাইরে হয়তো ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে ঘরের ভেতরে বসে তা টেরই পাওয়া যায় না | মেঘের চিত্রকলা আর আলোক নিয়ন্ত্রণ, গাছে গাছে বাতাসের নৃত্য সঞ্চালন, মেঘ আর বৃষ্টির যুগলবন্দী, এসব দেখা আর শোনার সুযোগই নেই এদেশে | অবশ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের এই দেশে ব্যতিক্রমী মানুষও আছে | এই আমেরিকাতেই প্রকৃতির সাথে এই বিচ্ছেদ কিছু কিছু মানুষ সহ্য করতে না পেরে স্বেচ্ছায় হয় আলাস্কার বনাঞ্চলে বা সমুদ্রতীরে যেখানে ঘন ঘন ঝড় হয় সেখানে গিয়ে একাকী বাস করে (৪)| এছাড়া পাশ্চাত্যে যারা স্বচ্ছল তারা প্রায়ই প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে ক্যাম্পিং করে | যারা নিয়মিত প্রকৃতির মধ্যে গিয়ে প্রকৃতির সাথে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করে তারা অবশ্যই উপকৃত হয় (৫)| কিন্তু এ সকল সুযোগ খুবই সীমিত | এভাবে অল্প কিছু ব্যক্তি হয়তো উপকৃত হতে পারে, কিন্তু সমাজমানসে এর কোন প্রভাব থাকে না |

বিলেতের গ্রামাঞ্চলের নিসর্গ ছবির মতো সুন্দর | ফরাসি দেশেও কিছুটা তাই | হয়তো সেই কারণে এই দুটি দেশ থেকে বহু মহান শিল্পী সাহিত্যিক তৈরী হয়েছে | অবশ্য বিলেতের গ্রামাঞ্চল দেখে মনে হয় যেন কোন বিখ্যাত রূপসজ্জাকরের হাতে সাজানো রূপসী, আর ফরাসি গ্রামাঞ্চল দেখে মনে হবে

যেন না সেজেই সে সুন্দরী | তার সাজগোজের দরকারই হয়নি | ছবি দেখে ইউরোপের অন্যান্য দেশে প্রকৃতির রূপে যে তারতম্য দেখা যায়, সেসব দেশের ব্যক্তি ও সমাজমানসও নিশ্চয় সেভাবেই প্রভাবিত হয়|

কিন্তু বিলেতে গ্রামাঞ্চলের প্রকৃতি আসলেই বইতে আঁকা ছবির মতো - গোছানো এবং নিয়ন্ত্রিত | বাংলার প্রকৃতির মতো উচ্ছ্বসিত অকৃপণ নয় | শীতের কারণে সেখানেও বাড়িঘর কিছুটা প্রকৃতি বিচ্ছিন্ন | কিন্তু বিলেতে যেহেতু প্রায় সারা বছর মেঘ আর বৃষ্টি থাকে সেজন্য তারা দৃশ্যমান | একসময় পৃথিবী শাসন করে ইংরেজ চরিত্রে যে ঐতিহাসিক অহমিকা ও উন্নাসিকতা তৈরী হয়েছে, তাকে ছাপিয়ে যায় তাদের আচরণে সংযমের প্রাধান্য | দক্ষ শিল্পীর হাতে আঁকা বিলেতের প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রিত ছবির মতো | পরিচয় বা প্রয়োজন না থাকলে একজন ইংরেজ পথেঘাটে অন্য স্বদেশী স্বজাতির সাথেও কথা বলে না | এছাড়া সাধারণভাবে 'ইংলিশ জেন্টলম্যান' আসলেই ভদ্র | তাকে নষ্ট করেছে তার সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকা | একজন ইংরেজকে একটি স্বরচিত রচনা পড়ে শোনালে তা যদি তার পছন্দ না হয়, সে ভদ্রতা কর বলবে, 'Well, it is interesting.' ঘনিষ্ঠ না হলে এর চাইতে কঠোর কিছু সে বলবে না | অথচ, আসলে সে বলতে চাইছে যে লেখাটা তার মোটেই পছন্দ হয়নি|

আমেরিকায় কিছুটা নৈসর্গিক বৈচিত্র দেখা যায় ক্যালিফোর্নিয়ায় | সে কারণেই হয়তো ক্যালিফোর্নিয়ার মানুষও একটু ভিন্ন প্রকৃতির | এমন বৈচিত্র আমার না দেখা অন্য রাজ্যেও থাকা সম্ভব | আশ্চর্য বিষয় এই যে রাজ্যভেদে বা প্রদেশ ভেদে প্রকৃতির মধ্যে যদি সূক্ষ্ম প্রভেদ থাকে, মানুষ সেই প্রভেদের কারণেও প্রভাবিত হয় | পশ্চিমবাংলা ও পূর্ববাংলার প্রকৃতি ও নিসর্গ এই দুই বাংলার মানুষের কাব্যমানসে যে সূক্ষ্ম প্রভেদ গড়ে দিয়েছে হুমায়ুন কবির তার অসামান্য বিশ্লেষণ করেছেন|

হুমায়ুন কবির লিখেছেন, "কেবলমাত্র ঋতুর লীলা নয়,- বাংলার নৈসর্গিক সংগঠনের বৈচিত্রও কম নয় | সমুদ্রমেখলা সোনার বাংলা, মাথায় তার হিমালয়ের কিরীট | আকোটি কণ্ঠ-জড়ানো গঙ্গা-পদ্মা-যমুনা-মেঘনা তার মালা | পশ্চিমবাংলায় শালবন আর কাঁকরের পথ-দিগন্তে প্রান্তর দৃষ্টিসীমার বাইরে মিলিয়ে আসে | শীর্ণ জলধারার গভীর রেখা কাটে দীর্ঘ সংখ্যাহীন স্রোতস্বিনী | বাতাসে তীব্রতার আভাস, তপ্ত রৌদ্রে কাঠিন্য, দিনের তীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট দীপ্তির পর অকস্মাৎ সন্ধ্যার মায়াবী অন্ধকারে সমস্ত মিলিয়ে যায় | রাত্রিদিনের অনন্ত অন্তরাল মনের দিগন্তে নতুন জগতের ইঙ্গিত নিয়ে আসে, তপ্ত রৌদ্রালোকে মূর্ছাহত ধরণী অন্তরকে উদাস করে তোলে | পশ্চিমবাংলার প্রকৃতি তাই বাঙালির কবিমানসকে যে রূপ দিয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে লোকাতীত রহস্যের আভাস | অনির্বচনীয়ের আস্বাদে অন্তর সেখানে উন্মুখ ও প্রত্যাশী, জীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম ও প্রচেষ্টাকে অতিক্রম করে প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণ (১)|"

এইভাবে একজন প্রখর অনুসন্ধিৎসু কবির অন্তরদৃষ্টি দিয়ে বাঙালির কাব্যমানসে পশ্চিমবাংলার অম্লমধুর রূপের এক সম্মোহিনী প্রভাবের চিত্র রচনা করেছেন হুমায়ুন কবির|

তারপর তিনি একই দক্ষতায় তুলনা করেছেন পূর্ববাংলার কবিমানসে তার প্রকৃতির প্রভাব|

তিনি লিখেছেন, "বাংলার পূর্বাঞ্চলের প্রকৃতি ভিন্নধর্মী | পূর্ববাংলার নিসর্গ হৃদয়কে ভাবুক করেছে বটে, কিন্তু উদাসী করেনি | দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অভাব সেখানেও নেই, কিন্তু সে প্রান্তরে রয়েছে অহোরাত্র জীবনের চঞ্চল লীলা | পদ্মা-যমুনা-মেঘনার অবিরাম স্রোতধারায় নতুন জগতের সৃষ্টি ও পুরাতনের ধ্বংস | প্রকৃতির বিপুল শক্তি নিয়তই উদ্যত হয়ে রয়েছে, কখন আঘাত করবে তার ঠিকানা নেই | কূলে কূলে জল ভরে ওঠে, সোনার ধানে পৃথিবী ঐশ্বর্যময়ী, আর সেই জীবন ও মরণের অনন্ত দোলার মধ্যে সংগ্রামশীল মানুষ | প্রকৃতির সে ঔদার্য, সৃষ্টি ও ধ্বংসের সেই সংহত শক্তি ভোলবার অবসর কই? চরের মানুষ নদীর সাথে লড়াই করে, জলের ঐশ্বর্যকে লুটে জীবনের উপাদান আনে | তাই লোকাতীতের মহত্ত্ব হৃদয়কে সেখানেও স্পর্শ করে, কিন্তু মনের দিগন্তকে প্রসারিত করেই তার পরিসমাপ্তি | প্রশান্তির মধ্যে আত্মবিস্মরণের সেখানে অবকাশ কই?" (১)

এই চরের মানুষদের আমি কাছ থেকে দেখেছি | দেখেছি তাদের পরিবেশ ও জীবন | যে জীবন ও পরিবেশ তাদের লড়াই করতে বাধ্য করে | যে জীবন তাদের করে তোলে সংশপ্তক যোদ্ধা (৬)| দেখেছি বাংলার প্রকৃতি ও নিসর্গের মাঝে অপার সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যময় নাটকীয় জীবনবৈচিত্র|

"আমার নিশীথরাতের বাদলধারা, এসো হে গোপনে
আমার স্বপ্নলোকে দিশাহারা|"

অথবা,

"এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়|"

বাংলার নিসর্গ আর তার পটভূমিতে বাংলার বর্ষারাত যে কবি দেখেনি, লেখা তো দূরের কথা, এমন সব ভাবনাই কি তার মনে আসা সম্ভব? বাংলার মোহময়ী কোমল প্রকৃতি কবির মনকে যখন দিশাহারা স্বপ্নলোকের সন্ধান দেয়, তখন বিলেতের হিমশীতল নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রেরণায় কবি লেখেন ভিন্ন এক প্রকৃতির কথা, যে প্রকৃতি মানুষকে স্বপ্ন দেখায় না, তাকে টেনে নামিয়ে আনে কঠোর বাস্তব জগতে |

Then meet and join: Jove's lightning, the precursors
O' Th' dreadful thunder-claps, more momentary
And sight-outrunning were not: the fire and cracks
Of sulphurous roaring the most mighty Neptune
Seem to besiege and make his bold waves tremble,
Yea, his dread trident shakes.

(Tempest - Shakespeare)

তাই আমার বিশ্বাস, সুখে-দুঃখে, মিলনে-বিরহে, সংগ্রামে-শান্তিতে, জীবনের যাবতীয় সংঘাতের মধ্যেও বাঙালির হৃদয়বৃত্তিতে অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার মত প্রবাহিত হয় যে অনন্ত সুন্দর আর শুভ অর্জনের প্রয়াস, তার ওপর বাংলার এই প্রকৃতি ও নিসর্গের প্রভাব অনস্বীকার্য |

****

(১). বাংলার কাব্য | হুমায়ুন কবির | আনিসুজ্জামান সম্পাদিত | প্রথম প্রকাশ কার্তিক ১৪২২/নভেম্বর ২০১৫ | প্রকাশক: মোবারক হোসেন, পরিচালক - গবেষণা, সংকলন এবং অভিধান ও বিশ্বকোষ বিভাগ | বাংলা অ্যাকাডেমি, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ |

(২). Classics Western. O. Wister, W. Cather, Z. Grey, M. Brand. Canterbury Classics. Published by Peter Norton. 10350 Burnes Canyon Road. Suite 100. San Diego. CA-92121. USA.

(৩). তেলের দেশে পাঁচ বছর | শাহাবুদ্দিন | প্রথম সংস্করণ: ৪ কার্তিক, ১৪০৯/১৯ অক্টোবর ২০০২ | প্রকাশক- ডাঃ শাহেদ পারভীন | ৯০, কলাবাগান, দ্বিতীয় লেন, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫, বাংলাদেশ |

(৪). OBX. David Alan Harvey. National Geographic. June 2012. PP 60-61.

(৫). The relationship between Nature connectedness & happiness: a meta-analysis. Colin A Capaldi, Raelyn L Dopko, & John M Jelenski. Front Psychol. 2014; 5: 976.

(৬). সমুদ্র ও চরুয়া | শেলী শাহাবুদ্দিন | স্বদেশ শৈলী | প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা| অশ্বিন ১৪২৩ বঙ্গাব্দ/অক্টোবর ২০১৬ | উডব্রিজ, ভার্জিনিয়া, উত্তর আমেরিকা |

অনুগল্প

ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা-টি

মেয়েটি মায়ের কোলে পাঞ্চেতে এসেছিল, বাবার চাকরিস্থলে | তারপর জীবনের প্রথম পঁচিশ বছর এখানে কাটিয়েছিল | তার শৈশব কৈশোর প্রথম যৌবন এখানে | এখানে সে বড় হয়, স্কুলে যায় | এখান থেকে কলেজ যায় | এখান থেকেই তার বিয়ে হয় | দুর্ভাগ্যজনকভাবে তার বিয়ে স্থায়ী হয় না | সে একা হয়ে যায় এবং পাঞ্চেতে বাবা মা'র কাছে ফিরে আসে | একসময় তার বাবা অবসর নিয়ে পাঞ্চেত ছাড়ে, মেয়েটি বাবা মা'র সঙ্গে পাড়ি দেয় নতুন ঠিকানায় | তার দুই ভাই এখন নিজেদের কর্মস্থলে, এক বোন শ্বশুরবাড়িতে | ইতিমধ্যে মেয়েটির বাবা মা চলে যায় অনন্তের উদ্দেশ্যে | মেয়েটি একাই দিন কাটায় |

এই পরিবারটি পাঞ্চেতে আমার প্রতিবেশী ছিল | আমার তরুণী স্ত্রী আশির দশকে পাঞ্চেতে গিয়ে কয়েকটি পরিবারের সঙ্গে মিশে যায় | সেই সব দিদিরা অনভিজ্ঞ নবীন সংসারীর যাবতীয় দায় হাসি মুখে মিটিয়ে দিত | এই মেয়েটির মা ছিল তাদের একজন | কোন রান্না কেমন করে করবে, কিসে কী ফোড়ন দেবে প্রয়োজন হলেই এক দৌড়ে চলে যেত এদের বাড়ি | ছেলেকে স্নান করিয়ে দুধের বোতলসমেত এদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে নিজের স্নান ও ঘরের কাজ সেরে নিত | দিদিরা বাচ্চার অসুখে পাশে থেকে সাহস দিত, সাহায্য করত | অবসরে একসঙ্গে হাসি মজা হত |

ঘটনাচক্রে এই মেয়েটি এখনও আমাদের প্রতিবেশী | এখন আমার স্ত্রীর সেই ঋণ শোধ করার সময় | সে কর্তব্যে তার অবশ্য ত্রুটি নেই | তাকে সঙ্গ দেওয়া, অসুখ-বিসুখে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া, একসঙ্গে পুজোর বাজার করতে যাওয়া, কোথাও বেড়াতে গেলে ওকে দলে টেনে নেওয়া এসব ও করে থাকে |

রূপনারায়ণপুরে আমাদের এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাবার সময় ও মেয়েটিকে সঙ্গী করল | সেখানে গিয়ে ওর মনে হ'ল এত কাছে এসে একবার পাঞ্চেত যাওয়া হবে না! আমি ওকে বোঝালাম পাঞ্চেত এখন ধ্বংসস্তূপ, তুই পুরনো পাঞ্চেতের কিছুই আর পাবি না | শুধু শুধু মন খারাপ হবে | কিন্তু কথাটা তার

মনঃপুত হ'ল না | ওর সঙ্গে কথা বলে আমি বুঝলাম পাঞ্চেতের এত কাছে এসে ও তার আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না | যেহেতু ওর ভবিষ্যত জীবনে কোনও রূপালী রেখার চিহ্নমাত্র নেই, অতীতই তার একমাত্র সম্বল | পঁচিশ বছর পাঞ্চেতে কাটানোর পর আরও পঁচিশ বছর কেটে গেছে | তবু পাঞ্চেতের ওপর ওর অদ্ভুত আবেগ |

হাজির হলাম সকলকে নিয়ে পরেরদিন পাঞ্চেতে | বহুদিনের চেনা জায়গাগুলো একে একে চোখের সামনে আসতে লাগল | এইখান থেকে বাবা দুধ নিয়ে যেত, ওই তো মাইতির দোকান, এই কালিবাড়িতে প্রতি অমাবস্যা রাত্তিরে ভোগ খেতে আসতাম | এই ক্লাবে কত নাটক দেখেছি, কত অনুষ্ঠানে নিজেরা নেচেছি, গান করেছি |

- বিমল?

- তুই মহুয়া?

চল্লিশ বছর আগে এরা একসঙ্গে বাসে করে দিসেরগড় ইস্কুলে যেত | কত কথা হ'ল ওদের | আমরা শ্রোতা | কিছু চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হ'ল | স্মৃতিতে থাকা সতেজ মুখগুলোয় সময় চাবুক মেরে কত রেখা এঁকে গেছে |

পথে যেতে যেতে দেখা গেল আমাদের কোয়ার্টারগুলো সব মাটিতে মিশে গেছে | আমার এসব জানাই ছিল | আমি কাজের সুবাদে বিভিন্ন সময়ে বার বার সেখানে গেছি | পাঞ্চেতের এই পরিবর্তন আমার চোখে হঠাৎ নয় | তাছাড়া আমার যেহেতু আরও অতীত আছে, বর্তমান আছে, ভবিষ্যতও আছে তাই আমার আবেগ নিয়ন্ত্রিত | কিন্তু মেয়েটির তা নয় | আমি ওকে নিয়ে গেলাম সেই মাটিতে যেখানে ও ওর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়টা কাটিয়েছে | কোয়ার্টার মাটিতে মিশে গেছে | পাশের দোতলা কোয়ার্টারটা দেখিয়ে ওকে চিনতে সাহায্য করি | এই সেই মাটি | জঙ্গলে ঢাকা জায়গাটার মধ্যে থেকে মেয়েটি কোন চিহ্ন খুঁজে পেতে চেষ্টা করে, কিন্তু পায় না | আমি বলি দেখ তো, ঐ আম গাছটা - আমার তো মনে হচ্ছে...

মেয়েটি কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে চিনে নেয় আমগাছটাকে | - হ্যাঁ ঐ আমগাছটা ছিল আমাদের উঠোনে, আর ঐ বেলগাছটা পেছনদিকে | ও খুঁজতে থাকে আরও কোন চিহ্ন যদি পাওয়া যায় | আমি ওর মগ্নতায় কোনও বাধা দিই না |

দূরে দাঁড়িয়ে আমি ভাবছিলাম অন্য এক বেদনার কথা | এই জায়গাটা বা বাড়িটা ওদের নিজস্ব ছিল না | বাবার অবসরের পর ওদের অন্যত্র চলে যেতে হবে এ ওদের জানা ছিল | তাই বাস্তবে হয়েছে | জায়গাটার প্রতি মেয়েটার মায়া দেখে আমি ভাবছিলাম সেইসব মানুষদের কথা যাদের দেশ একদিন ভাগ হয়ে গিয়েছিল | যারা প্রাণ বাঁচাতে নিজেদের ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘর-বাড়ি, পুকুর-বাগান, ধবলী গাইয়ের মায়াভরা চোখ, সাদা কালো ছাগলছানা অথবা পোষা হাঁসের ঝাঁক, যার যা ছিল সব ফেলে রাতের অন্ধকারে দেশান্তরী হয়েছিল | বহুদিন পরে পরিস্থিতি অনুকূল হলে সময় সুযোগ করে তারা কেউ কেউ যখন নিজেদের জন্ম ভিটেয় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারা কতটা আবেগপ্রবণ হত - আমি আন্দাজ করতে চেষ্টা করছিলাম |

অন্নদাস

বিজ্ঞান কংগ্রেস থেকে বাড়ি ফিরে বিজ্ঞানী প্রশ্নের মুখে পড়লেন | ততক্ষণে জাতীয় টেলিভিশনে খবর প্রচারিত হতে শুরু করেছে |

- বাবা, এসব তুমি কী বলেছ? পুষ্পক রথ মানে এরোপ্লেন, গণেশের দেহে হাতির মাথা ট্র্যান্সপ্ল্যান্ট করা হয়েছিল, কৌরবরা সব টেস্টটিউব বেবি |··· তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল?

মেয়ে অতটা রূঢ় হতে পারল না | বলল, বাবা তুমি আমাদের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস বলতে | প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানের অগ্রগতি বোঝাতে তুমি তো আমাদের অন্য গল্প শোনাতে | তুমি বলতে, প্রাচীন ভারতে আর্যভট্টের যুগান্তকারী শূন্য আবিষ্কারের কথা | আর্য্যভট্ট ষষ্ঠ শতাব্দীতেই সৌরকেন্দ্রিক গ্রহদের অবস্থানের কথা এবং পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির কথা বলেছিলেন কোনওরকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ছাড়াই | উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থাও প্রাচীন ভারত পেয়েছিল শুশ্রুত, চরক প্রভৃতি ঋষিদের হাত ধরে | তুমি বলতে কোনও কারণে আমাদের বিদ্যাচর্চার ধারাবাহিকতা থমকে গিয়েছিল | তাই এইসব আবিষ্কারই আবার পাশ্চাত্য দেশ থেকে আমাদের আমদানি করতে হয়েছে |... বাবা তোমার তো এইসব বলার কথা | কিন্তু তুমি এসব কী বলছ?

প্রৌঢ় বিজ্ঞানী ছেলে মেয়েকে কী উত্তর দেবেন ভেবে পান না | শেষে বলেন - শোন, তাহলে আজও একটা গল্প বলি |

১৫৪৩ সালে কোপারনিকাস পৃথিবীর সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণের তত্ত্ব বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠা করেন | কিন্তু এই তত্ত্ব বাইবেল বিরোধী হওয়ায় চার্চ তা নিষিদ্ধ করে | ১৬১২ সালে গ্যালিলিও এক ছাত্রের কাছে চিঠি লিখে কোপারনিকাসের তত্ত্ব সমর্থন করেন | চার্চ ১৬১৬ সালে এই তত্ত্বকে বাইবেল বিরোধী বলে

ঘোষণা করে গ্যালিলিওকে একে সমর্থন করতে নিষেধ করে | প্রাথমিকভাবে গ্যালিলিও সাত বছর কোনরকম ঝামেলা এড়াতে চার্চের নির্দেশ পালন করেন | চার্চ গ্যালিলিওকে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গবেষণা চালিয়ে যেতে অনুমতি দেন এই শর্তে যে তাতে কোপারনিকাসের তত্ত্বের সমর্থন থাকবে না |

কিন্তু অবশেষে গ্যালিলিও শর্ত ভঙ্গ করেন এবং ঘোষণা করেন যে যে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে | তাকে ধর্মদ্রোহীতার দায়ে অভিযুক্ত করে গৃহবন্দী করা হয় |

এটা অবশ্য এই গল্পের বিষয় নয় | বিষয়টা হ'ল গ্যালিলিও যখন প্রাথমিকভাবে চার্চের সঙ্গে সমঝোতা করেছিলেন তখন এক ছাত্র তাকে বলেন, 'আচার্য্য, চার্চের ভয়ে আপনার এতদিনের গবেষণার ফল প্রকাশ করা গেল না... |' গ্যালিলিও মৃদুকণ্ঠে উত্তর দেন - 'আমি বলি আর না বলি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে এবং তাই ঘুরবে |'

স্বদেশ

দাদু ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী | জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ফিরলে সারা গ্রামের মানুষ সম্বর্ধনা জানিয়েছিল | দেশবন্ধু ভক্ত ছেলে মেয়েদের নাম রেখেছিলেন স্বরাজ, বাসন্তী, কল্যাণী | এসব গল্প বালকটি মায়ের কাছে শুনেছিল |

মামার বাড়িতে মার্গো সাবান, নিম টুথপেস্ট আসত | বালকটি একদিন মামাকে প্রশ্ন করেছিল - তোমরা তেতো সাবান, তেতো মাজন কেনো কেন?

- তেতো কী রে? ক্যালকাটা কেমিক্যাল |
- তেতোই তো | অন্য আনতে পারো না?
- না রে |
- কেন?
- ওটা যে ক্যালকাটা কেমিক্যাল, স্বদেশী জিনিস | ও তুই বড় হলে বুঝবি |

পঞ্চাশ বছর পরে আর এক বালকের প্রশ্ন - দাদু তুমি কী সিম নিয়েছ? কখনই তোমার ফোনে টাওয়ার থাকে না, নেট ঘুরেই চলেছে | মা ফোন করে তোমাকে পায় না | তুমি সিমটা বদলাতে পারো না?

- না রে, ওটা যে বি এস এন এল |
- মানে?
- ওটা ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড | স্বদেশী জিনিস |
- তাতে কী?
- ও তুই বড় হলে বুঝবি |

হাঁটি হাঁটি পা পা

হাঁটি হাঁটি পা পা | এই তো হয়েছে - এবার এই পা টা, আয় আয় - এবার ঐ পা | হ্যাঁ, ঐ তো পারছিস | বিমলা মেয়ের হাতটা ছেড়ে দিয়ে দুহাত বাড়িয়ে কোলে নেবার ভঙ্গী করে |

দিশা খিল খিল করে হেসে নিজে নিজেই একটা দুটো পা ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে |

বিমলা প্রবাসী স্বামীকে চিঠি লেখে - জানো, দিশা আজ হেঁটেছে, নিজে নিজে |

***

হাঁটু প্রতিস্থাপন করে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বিমলা এখন বিদিশার কাছে, বিশ্রামে |

- মা, আজকে তুমি হাঁটবে, ওয়াকার ছাড়া |
- পারব? পড়ে যাব না তো?
- আমি তো আছি, ভয় কী?

বিমলা আজ হাঁটল, কারও সাহায্য ছাড়াই | বারান্দার এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিকে |

বিদিশা ফোন করল বাবাকে - বাবা, মা আজ হেঁটেছে, নিজে নিজে |

মা

মাটিতে হাত দিয়ে ভাত খেতে নেই, স্নান করে উঠেই নতুন জামা কাপড় পরতে নেই | কিছু একটু মুখে দিয়ে পরতে হয় | জন্মদিনে নতুন জামাটা দিয়ে মা একটা বাতাসা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত | কাউকে যাবার সময় পিছু ডাকতে নেই | খেয়ে উঠে আঁচিয়ে গোড়ালি ভিজিয়ে পা ধুতে হয় |

তখন বড় হচ্ছি, সব কিছুতেই 'কেন' বলাটা যেন বাহাদুরি | মা বলত অত 'কেন' বলতে নেই | বারণ করছি শোন |

দুধ মুড়ির বাটিতে কলা ছাড়িয়ে দেবার সময় মা কলাটা ভেঙে দিত | গোটা কলা ছাড়িয়ে দিতে নেই | কেন মা? দিলে কি হয়? মায়ের মোক্ষম উত্তর, 'মা মরে যায়' | আমার প্রশ্ন থেমে যেত |

সেদিন মুন্ডিত মস্তকে বসেছি | সামনে অনেক থালা, নানা উপাচার সাজানো | একটায় ভর্তি কলা, ছাড়ানো, গোটা গোটা | সামনে মালা দেওয়া মায়ের ছবি তখন হাসছে |
- আজ বুঝতে পারলি 'কেন'?

{শ্রী ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা-নিবাসী |
বর্তমানে সাহিত্য-মহলে তাঁর বিশেষ পরিচিতি লক্ষ্য করা যায় | তাঁর কিছু রচনা শ্রীমতী সুমিতা বসুর সৌজন্যে আমরা পেয়েছি | গল্পগুলি সহজেই আমাদের মনে একটা জায়গা করে নেয় | তাঁর লেখা ছোট গল্পের বই "গল্পের খোঁজে" ২০১৭ সালে "ইন্ডিক হাউস" থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে পাঠক সমাজে | ত্রিদিবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তেমনই কিছু অনুগল্প এখানে রাখলাম |}

উত্তরণ

জয়শ্রী বাগচী

অফিসে পৌঁছানোর কিছুক্ষণ পরেই অতি পরিচিত সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরটা বেজে উঠল |
স্বর্ণাভ দত্ত দরকারি কয়েকটি কাগজে সই করতে করতেই মোবাইলে চোখ রাখল; টিনা, হোম মিনিস্টার, ফোনটা না ধরলেই গৃহযুদ্ধ | তাছাড়া বিনা কারণে ও তো সকাল সকাল এভাবে ফোন বাজায় না, দেখাই যাক...
"হ্যাঁ বলো, কি হ'ল আবার?"
"এই শোন, তুমি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মায়ের জরুরী তলব, আজ লাঞ্চ আওয়ারে আমাদের দুজনকেই দেখা করতে হবে, কী সব দরকারী কথা আছে | ভুল যেন না হয়, বার বার বললেন | গলাটা কেমন যেন শোনালো, কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই কেটে দিলেন | তুমিও কি ফোন পেয়েছিলে?"
"কৈ না তো, দেখছি - হুঁ, ভোরের দিকে তিনটে মিসড্ কল | সায়লেন্টে ছিল, বুঝতেই পারিনি |"
হাতের কাজটুকু শেষ করে মাকেই প্রথম কল করল স্বর্ণাভ |
ওপাশে ফোনটা বেজে বেজে কেটে গেল | ঘড়ি দেখল, মা নিশ্চয়ই পুজোয় বসেছে | যাকগে, পরে আবার চেষ্টা করবে | কিন্তু পরে বহুবার চেষ্টা করেও কথা হ'ল না - ভাবল, শরীর খারাপ হ'ল নাকি! নাঃ, টিনার জন্য আর অপেক্ষা করা যাবে না, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এদিকটা একটু সামলে সে একাই গিয়ে দেখে আসবে মাকে | মনটা বিষণ্ন লাগল কিন্তু তবু ফেলে রাখা কাজে মন দিতে হ'ল |

স্বর্ণাভ আর রজতাভ, মায়েরই দেওয়া নাম | বাবার কর্মব্যস্ততার জন্যে মায়ের তত্ত্বাবধানেই তাদের বড় হয়ে ওঠা |
বাবার মৃত্যুর পর কিন্তু দুজনের কেউই মাকে নিজের কাছে নিয়ে যেতে পারেনি | জেদ ধরে বাবার কেনা ওই ছোট ফ্ল্যাটেই মা রয়ে গেছে, হয়তো স্বাধীনভাবে থাকতে পারবে মনে করেই | পরশুই তো কথা হ'ল, শরীর খারাপের আভাস তো সে পায়নি | না, এবার আর কোন ওজর আপত্তি নয় মায়ের একটা থরো চেকআপ করাতেই হবে... এইসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতেই স্বর্ণাভ গাড়িটা মায়ের ফ্ল্যাটের নীচে পার্ক করে লিফটে সাত তলায় উঠে এল |
বন্ধ দরজার বাইরে মায়ের পূজোর গন্ধ, মনটা একটু আশ্বস্ত হ'ল |

বেল বাজাল, একবার দুবার তিনবার... একটু অপেক্ষা, তারপর থেমে থেমে ছ'সাতবার।

দরজা খুলল না, এবারে সে ভয় পেয়ে গেল। এত শরীর খারাপ যে দরজাটাও খুলতে পারছে না? কিন্তু কাজের মেয়ে সুমি, সে কি আসেনি নাকি দুজনে কোথাও বেরিয়েছে? কাকে কী জিজ্ঞেস করবে কিছুই বুঝতে না পেরে টিনাকেই ফোন করল।

টিনা মনে করিয়ে দিল একতলায় পাঞ্জাবী মহিলার কাছে মায়ের ডুপ্লিকেট চাবিটার কথা।

নিমেষে সেটি নিয়ে এসে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল।

সামনেই এক ধবধবে সাদা ফুলের শয্যায় মা শুয়ে - ধূপ, অগুরুর গন্ধ বন্ধ ঘরে ম ম করছে, সঙ্গে ফুলেরও। এই গন্ধই তো সে বাইরে পেয়েছিল, তাড়াতাড়ি বাইরের দরজাটা বন্ধ করে দিল। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না - যা দেখছে সব সত্যিই তো! কখন হ'ল এসব আর কেইবা এভাবে সাজালো! তবে কি সুমিই সব করে বাড়ি চলে গেছে - কিন্তু ফোন করেনি কেন? নাকি সে আজ আসেইনি। তবে কি অন্য কিছু! আচ্ছা মা কি আগেই টের পেয়েছিল তাই ভোরবেলায় ফোন করে জানাতে চেয়েছিল! ইশ, ফোনটা কেন যে সায়লেন্টে রেখেছিল! মা তো না বুঝেই অভিমান করে টিনাকে আর কিছু বলেইনি। আচ্ছা মা রজতকেও নিশ্চয়ই জানিয়েছিল, কিন্তু সে তো এখনও এল না! আর টিনাকেও তো জানাতে হবে, কিন্তু কীভাবে? সবকিছু কেমন যেন মাথার মধ্যে জট পাকিয়ে গেল। কিচ্ছু ভেবে না পেয়ে হতাশ হয়ে সামনের সোফায় ধপ্ করে বসে পড়ল স্বর্ণাভ।

টিনার ফোন – "কি গো, ঢুকতে পেরেছ? সুমি দরজা খুলছিল না কেন? মা ঠিক আছে তো? কথা হয়েছে, কেন ডেকেছিলেন, কী দরকারি কথা ছিল –" ইত্যাদি একগাদা প্রশ্ন, এসবের আর কী উত্তর দেবে?

সে সংক্ষেপে বলল – "পরে সব জানাচ্ছি।" ফোনটা কেটে দিল। আর সেই মুহূর্তেই নজরে পড়ল মায়ের শয্যার পাশে একটা সাদা ভাঁজকরা কাগজ, এতক্ষণ দেখতে পায়নি কেন কি জানি!

চটপট তুলে দেখল মায়েরই হাতের লেখা।

এক নিঃশ্বাসে সবটা পড়ে ফেলল। কিছু মাথায় ঢুকল না, আবার পড়ল, তারপর পর পর আরও অনেকবার।

নিঃশব্দে দুচোখের দুটি ধারা গাল বেয়ে গড়িয়ে নেমে এল অবারিতভাবে।

ইশ, এতদিনেও সে মাকে একটুও চিনতে পারেনি। সে তো ভেবেছিল নিরোগ দেহমনে স্বাধীনভাবে মনের আনন্দে মা দিন কাটাচ্ছে। ভুল, সবটাই ভুল ছিল।

কী অভিমানভরা এ লেখা! মনের গভীর অনুভূতি ও কষ্টের কথা তাদেরই জানিয়েছে অথচ কোথাও সম্বোধনটুকু পর্যন্ত নেই। এত বড় এম এন সির অধিকর্তা এই প্রথম ডুকরে কেঁদে উঠল।

বেশ কিছুক্ষণ লাগল ধাতস্থ হতে। মন শান্ত হলে হাতে ধরা চিঠিটা আরো একবার পড়ল।

মা লিখেছে -

অসময়ে অফিসের ব্যস্ততার মাঝে ফোন পেয়ে একটু কি বিরক্ত-রাগ কিম্বা চিন্তা বা ভয় - কি জানি আবার কী হ'ল!

আমার বয়সটাই তো তাই রে। কখন খবর আসে হার্ট অ্যাটাক বা কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট অথবা অন্য আরও কতকিছু - রোগের কি আর অন্ত আছে?

ঘরে ঢুকে সামনেই আচমকা মাকে শব-শয্যায় শায়িত দেখে স্তম্ভিত না হয়ে কি পারা যায়!

শয্যার চাদরটা নতুন হলেও নিচের তোশকটা কিন্তু নয়। ওটা তোদেরই কারো একজনের হস্টেলে থাকাকালীন পুরনো একটা তোশক, কারো কথায় আবার বদলে দিস না যেন। ওটা আমার অনেক সুখমিশ্রিত অনুভূতিকে মনে পড়িয়ে দিল। আজ ওটাতেই যে আমার শুতে ইচ্ছে করছে।

শ্বেতপদ্ম চেয়েছিলাম, এ পোড়া দেশে তা জুটল না। অগত্যা এই রজনীগন্ধা আর সাদা গ্ল্যাডিওলাস। আচ্ছা রজনীগন্ধা আবার বিয়ের সুরভি ছড়ায়নি তো? এই গুলঞ্চ আর কাঠটগরও আমার খুব প্রিয়, তাই সবাইকে আমার শেষ যাত্রার সঙ্গী করলাম।

পাশের ঘরে শেষ কৃত্যের সরঞ্জাম গুছিয়ে রাখা আছে। লিস্ট মিলিয়ে কিনেছি একটি একটি করে পাছে কিছু ভুল হয়ে যায়। ওই মাটির কলসি, গামছা, খৈ, ঘি, আতপচাল, তিল আরো কত টুকিটাকি দরকারি জিনিস, এমনকি বয়ে নিয়ে যাওয়ার খাটটাও।

আমার পরনে নতুন শাড়ি, কপালে চন্দনের টিপ, গঙ্গাজল মুখে দিয়েছি, মাথার তলায় গীতা, প্রদীপও জালিয়ে রেখেছি। ফ্রিজে একবাক্স মিষ্টি আছে, শ্মশান ফেরত ওই লোহা, আগুন, নিম ছুঁয়ে মিষ্টি খেতে হয় যে!

আমার জন্য বিশেষ নিয়ম মানার দরকার নেই। দশদিন অফিস কামাই করে কাছা পরে হবিষ্যি খেতে হবে না। আর মাথা ন্যাড়া, ওসব ব্যাকডেটেড নিয়ম আজকাল কেউ মানে না।

ফ্রিজের মাথায় প্লাস্টিকে মোড়া একগোছা গঙ্গা রেডি আছে। সামাজিকতাকে তো আর বাদ দেওয়া যায় না! তবে দানধ্যান

করে শ্রাদ্ধ-শান্তির কোন দরকার নেই | ওই নিয়ম রক্ষা, পরে সুবিধামতো আমার পরিচিতজনদের একটু মিষ্টি মুখ করালেই আমার আত্মা তৃপ্তি পাবে|

এসব মিটলে দেরাজে বাড়ির দলিল, ব্যাঙ্কের হিসেব, আরো দরকারি টুকিটাকি কাগজপত্র - ওপরের ওই নীল ডায়েরিটা তোরাই তো কেউ দিয়েছিলি পাঁচ বছর আগে - সব লেখা আছে ওতেই|

এই বাড়িঘর, আসবাবপত্র, টাকাপয়সা কোন কিছুই তো আমার ছিল না| আমার হেফাজতে ছিল, আগলে রেখেছিলাম মাত্র| এর বেশিরভাগই তোদের বাবার, আর অনেক কিছুই তোদেরও | মনে পড়ে একসময় কত ঘুরে ঘুরে তিন মা-বেটায় ক্লান্ত হয়ে এক একটা জিনিস কিনেছিলাম | সব রেখে গেলাম তোদেরই জন্য যা ইচ্ছে হয় করিস|

তোরা দু'ভাই যে অর্থ সাহায্য করতিস তা আমি বিশেষ খরচ করতে পারিনি রে| আর তোদের বাবার জীবৎকালে তার টাকাও ঠিক নিজের বলে মেনে নিতে পারিনি| সে টাকা খরচে যে হিসেব দিতে হত| নিজের জিনিসে জবাবদিহির জায়গা কোথায়?

নিজের কিছু ছিল না বলেই তো তোদের চলে যাওয়ার মুহূর্তে নীরব ছিলাম| পরের ধনে পোদ্দারি করি কী করে বল তো?

নিজের অর্থ থাকলে নিজের লোকেদের মাঝে এ অনর্থ হতেই দিতাম না|

সেদিন কিন্তু আমার কথা তোদের একবারের জন্যও মনে হয়নি যে এ সংসারের ভাগাভাগিতে আমারও কিছু বলার থাকতে পারে|

এই সংসার রক্ষণাবেক্ষণ, রান্না করে খাওয়ানো, অসুস্থতায় সেবা করা আর ছেলে মেয়েদের প্রতিপালন এ সবকিছুই তো পয়সার বিনিময়ে যে কোন কাউকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া যায়| আমি না করলে আর কেউ করে দিত | বাইরের লোকের তবু কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অবকাশ থাকে, কিন্তু নিজের লোকের কপালে সেটুকুও জোটে না রে | এসবের পেছনে যে ভালবাসার ছোঁয়া আর স্নেহের পরশ থাকে কর্তব্যের ভীড়ে তা যেন কোথায় তলিয়ে গিয়ে চাপা পড়ে যায়| তাই হয়তো আমার কথাও কারোর মনেই পড়েনি|

অনেকবার জানতে ইচ্ছে করেছে এই সাংসারিক বিভাজন মিটিয়ে ফেলা কি যেত না কোনভাবেই? নিজেকে গুটিয়ে নিতে নিতে আর জিজ্ঞেস করতেই মন চায়নি| হয়তো আমাদের জন্য খরচাপাতিটুকুই তোদের অপচয় বলে মনে হয়েছিল|

আমার আজকের এই পরিণতি অনেক আগেই ঘটানো যেত, কিন্তু তোদের কথা দিয়েছিলাম যে পর প্রজন্মকে সঙ্গ দেব; সে লোভ ছাড়তে পারলাম কই! যে অর্থ একদিন অনর্থের কারণ হয়েছিল তা আজও সঞ্চিত আছে| তোদের বাবা তিল তিল করে জমিয়ে রেখেছিল তার অবর্তমানে আমার ভাল থাকার জন্য | সেই জোরেই তো আজ পর্যন্ত মাথা উঁচু করে কাটিয়ে গেলাম| তার কাছে এইজন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ | তার অনেকটাই রেখে গেলাম আমার দ্বিতীয় প্রজন্মের জন্য | অপ্রয়োজনীয় মনে হলে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দিস, কাজে লেগে যাবে | বেঁচে থাকার জন্য যখন কারোর সাহায্য দরকার হয়, নিজেকে ঠিক সেই পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারলাম না| অভিমান নিয়ে বাঁচা যায় কিন্তু কারোর দয়া দাক্ষিণ্য, করুণা বা তাচ্ছিল্য নিয়ে কখনোই নয় | তাই আজ আমার এই ইচ্ছা মৃত্যু, তাই ওই মুখাগ্নির অংশটুকু ছাড়া শেষকৃত্যের সব আয়োজন আজ সমাপ্ত| আমার জন্য তোদের কারোর আর কোনো অপচয় যেন না হয়| আমার এই ইচ্ছা মৃত্যুকে আত্মহত্যার দায়মুক্ত করার জন্যই আজকের এই লেখার সঙ্গে ওঘরে সিরিঞ্জটাও রেখে গেলাম| তোরা সবাই ভাল থাকিস|

কলিংবেলটা বেজে উঠতেই স্বর্ণাভ চমকে উঠল| টিনা কোন খবর না পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে| জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো স্বর্ণাভর দিকে | স্বর্ণাভ নীরবে হাতে ধরা চিঠিটা টিনার দিকে এগিয়ে দিল|

মোবাইলে তখন রজতের নাম, একটানা বেজে চলেছে সেই পরিচিত সুর 'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম...'

{আজকের 'চলো পাল্টাই'-এর যুগে গত প্রজন্মের এক মায়ের বদলে যাবার কথা}

ভূল শংসোধন

সুজয় দত্ত

কী মনে হচ্ছে এ-লেখার শিরোনামটা দেখে? এই পত্রিকার অন্যত্র যা যা ছাপার ভুল-টুল আছে তার তালিকা? নাকি আমি অতীতে যতরকম ভুলভ্রান্তি করেছি সেগুলো নিয়ে অনুতাপ-পরিতাপের তেলে চুপচুপে করে ভাজা আর নস্টালজিয়ার চিনির রসে ডোবানো করুণ কাহিনী? কিংবা হয়তো মানুষ তার নশ্বর জীবনে যেসব বেঠিক কাজকর্ম করে বা বেচাল চালে সে-বিষয়ে লম্বা গুরুগম্ভীর লেকচার আর একগাদা অযাচিত উপদেশ? নাঃ, হ'ল না, ডাহা ফেল | এক্কেবারে গোল্লা | এবং এ-থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনি আর যাই হন, মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের খাতা দেখা বাংলার মাস্টারমশাই (বা দিদিমণি) নন | তা যদি হতেন, ওপরের ঐ শিরোনামে যে দুখানা জলজ্যান্ত বানান ভুল রয়েছে সেদুটো আপনার "লাল পেন্সিল" চোখে প্রথমেই নজরে পড়তো আর বুঝতে পারতেন এ-লেখার আসল বিষয়বস্তু ভুল বানান |

হ্যাঁ, ভুল বানান | কী বলছেন, আপনার ওসব হয় না? ছি ছি, মিথ্যে বললে আবার চিত্রগুপ্তের খাতায় লাল দাগ পড়বে যে! অবশ্য জানি না চিত্রগুপ্ত আজকাল লাল পেন্সিল ব্যবহার করে, না তার ল্যাপটপের ওয়ার্ড প্রসেসরের অটোমেটিক হাইলাইটার | যাইহোক, পৃথিবীতে যেমন একটাও মানুষ নেই যে হামাগুড়ি থেকে হাঁটতে শেখার সময় একবারও আছাড় খায়নি বা বয়ঃসন্ধিতে বিপরীত লিঙ্গের কারোর দিকে একবারও আড়চোখে তাকায়নি, তেমনি একটা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ খুঁজে দিন তো আমায় দেখি, যে জীবনে বানান ভুল করেনি? নগদ পঞ্চাশ টাকা বাজী রেখে বলতে পারি (সরি, আমার পকেটে ওর বেশী থাকে না) যে পারবেন না | ওঃ, বুঝেছি কিসের ভরসায় আপনার এত দেমাক | দরজা-বাবুর সূক্ষ্মকোমল জানালার "স্পেলচেকার" আর চাকরি-বাবুর আপেলমার্কা চালাকচতুর চলভাষের "অটো-কারেক্ট" - তাই তো? কী বলছি বোঝা গেলো না বোধহয়? আরে বাবা, Bill Gates-এর Microsoft Windows আর Steve Jobs-এর Apple smart phone-এর কথা হচ্ছে | তা ওসব তো ইংরেজী বানানের জন্য | যারা জন্মাবার পর মুখে মাতৃভাষা ফোটার আগেই কম্পিউটারের প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ার উৎপাতে যাদের বানানজ্ঞানের সাড়ে-বারোটা বেজে গেছে, তাদের যাতে ভুল বানানের জন্য বেইজ্জত হতে না হয় - দরজা-বাবু আর চাকরি-বাবু তাই ঐসব ব্যবস্থা করেছেন | ওতে আমার-আপনার, মানে ইলিশ আর রসগোল্লার দেশের লোকেদের কী উপকারটা হলো? বরং ঝামেলা আরো বেড়ে গেলো | ইমেলে বা হোয়াটস্যাপ-এ "বাংলিশ" (অর্থাৎ ইংরেজী হরফে বাংলা) লিখতে গিয়ে নিত্য নাকানিচোবানি খায় যারা, তাদের নিশ্চয়ই বলে বোঝাতে হবে না সমস্যাটা | এইতো সেদিন এক আত্মীয়ের কাছ থেকে হোয়াটস্যাপ পেলাম "Pepsi Coke Lemon Dakota Pine" | আমি মর্মোদ্ধার করতে হিমশিম খাচ্ছি, এমন সময় সে ফেসটাইম ভিডিওফোনে বললো আসলে লিখতে চেয়েছে "পিসি চোখে তেমন দেখতে পায় না"| এ তো তাও নিরীহ ব্যাপার | শুনেছি আমার এক বন্ধুর বন্ধু একবার দারুণ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিলো "অটোকারেক্ট"-এর এই বেয়াড়াপনার জন্য (সত্যিমিথ্যে জানি না)| তাদের পাড়ায় প্রতি শনিবার আবর্জনা আর রিসাইক্লিং-এর জিনিসপত্র নিতে গাড়ী আসে, কিন্তু এক শনিবার বেচারাকে সকাল সকাল অফিসে ছুটতে হওয়ায় সে ঐসব বাইরে বার করে রেখে আসার সময় পায়নি | অতএব অফিসে বসে সে বৌকে মনে করাবার জন্য হোয়াটস্যাপ-এ লিখলো "ময়লা ভেতরে, খালি বিনটা গেটের বাইরে | শনিবার না?" লেখার সময় খেয়াল করেনি, পরে দেখলো শ্রীমান অটোকারেক্টের পাকামিতে মেসেজ গেছে "My Love to Rekha. Living Together. Bye Roshni. Barna?" যাচ্ছেতাই কান্ড একেবারে | কারণ রেখা যে ওর শালীর নাম, আর রোশনি ওর বৌয়ের! ওর নিজের ডাকনাম বর্ণ (ভালো নাম সুবর্ণময়)|

মোদ্দা কথা, যতদিন না বাংলা "স্পেলচেকার" বা "অটোকারেক্ট" ঘরে ঘরে ব্লিচিং পাউডার বা ডিটারজেন্ট সাবানের মতো নিত্যব্যবহার্য হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, ততদিন বানান ভুল ছিল, আছে এবং থাকবে | ছেলেবেলার বেশ কিছু অম্লমধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে ওই জিনিসটার সঙ্গে | ক্লাস ওয়ানে একবার শ্রুতিলিখনের পিরিয়ডে ১৬ কে সোলো আর ১৯ কে উনিস লিখে খাতায় বড় বড় দুটো লালকালির কাটাচিহ্ন পেয়েছিলাম | আমার স্কুলজীবনে বানান ভুলের ওটাই প্রথম ঘটনা যা স্পষ্ট মনে আছে | তবে যে ছেলেটা আমার পাশে একই বেঞ্চে বসত, সে "র" আর "ড়"তে বড়রকম গন্ডগোল করায় ("আমড়া গরুড় গারিতে চরে বারি গেছিলাম" ইত্যাদি) ক্লাসটিচার সবিতাদির কাছে প্রকাশ্যে বকুনি খেয়েছিল - আমার অতটা দুর্দশা হয়নি | অবশ্য তারও আগে মন্টেসরির আপার নার্সারিতে পড়ার সময় ইংরেজী বানান

নিয়ে একটা বলার মতো ঘটনা ঘটেছিলো যার আসল মজাটা তখন ঠিক বুঝতে পারিনি | ডিসেম্বারে ছুটি পড়ার ঠিক আগে আমাদের রঙীন কাগজ কেটে ক্রিসমাস কার্ড তৈরী করা শেখানো হচ্ছিলো | বিক্রম খৈতান নামে আমার এক অবাঙালী সহপাঠী তার বানানো কার্ডে "Mary Christmas" লেখায় আন্টি যখন বললেন ভুল হয়েছে, সে ওটাকে মুছে যা লিখে আনলো তাতে উপস্থিত সব আন্টিই দেখলাম মুখ টিপে হাসছেন | কারণ এবারে ও লিখেছে "Marry Christmas"| এর চেয়েও মজার একটা গল্প শুনেছিলাম আমার কলেজ জীবনের এক বন্ধুর বোনকে নিয়ে | বন্ধু তখন সবে সেকেন্ডারী স্কুলে ঢুকেছে, তার বোন প্রাইমারীতে - অনেক নীচু ক্লাসে | বইপত্র পড়ার অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত | তবে দাদার আগ্রহে বাড়ীতে বাংলা ইন্দ্রজাল কমিক্স রাখা হয় বলে সেসব পড়ে একটু আধটু | সেই সূত্রে জাদুকর ম্যানড্রেক আর তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী "শয়তানের" (লুসিফারের বাংলা সংস্করণ) সঙ্গে পরিচয় ছিল | এরপর একদিন স্কুলে প্রেয়ারের সময় একটা সমবেত সংগীত শিখে এসে বাড়ীতে শোনালো যখন, দেখা গেলো ও মহা উৎসাহে গাইছে "চল রে চল সবে ভারত শয়তান"|

ওয়ার্ডরোবে যেমন কিছু কিছু জামাকাপড় দিনের পর দিন পড়েই থাকে কিন্তু ব্যবহার হয় না বা পুরোনো দিনের দালানকোঠায় যেমন কিছু কিছু ঘর সবসময় তালাচাবি বন্ধই থাকে, কোনো কাজে লাগে না, ইংরেজীতে Psychology আর Pneumonia-র P বা Knowledge আর Knife-এর K হলো সেইরকম | ওগুলোর জন্য ছোটবেলায় বানান পরীক্ষায় নম্বর কাটা গেলে কাউকে দোষ দেওয়া যায় না | বাংলায় ওই ঝামেলা নেই, কিন্তু নতুন ভাষাশিক্ষার্থীদের ল্যাজেগোবরে করে দেওয়ার জন্য রয়েছে কয়েকটা বহুরূপী | যেমন "ণ" আর "ন", "স", "শ" আর "ষ" এবং "র", "ড়" আর "ঢ়"| নীচু ক্লাসে শ্রুতিলিখনের সময় ওগুলোর একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করে কার সাধ্যি? "গূঢ় রহস্য" মানে যে ঠাকুমার হেঁসেল থেকে গুড় চুরি যাবার রহস্য নয়, কিংবা "আষাঢ়" যে খুব একটা আশার মাস নয় (রাতদিন তুমুল বৃষ্টিতে নিরাশ হয়ে ঘরেই আটকে থাকতে হয়), সেটা শিশুমনে গেড়ে বসতে একটু সময় লাগে | আর "মূর্ধা", "তালু", "দন্তমূল" - এসব শব্দের আসল তাৎপর্য বুঝতে গেলে তো রীতিমতো ফিজিওলজি জানতে হবে | সুতরাং একেবারে ছোটদের বাংলা বর্ণমালা শেখানোর সময় স্কুলে বা বাড়ীতে অনেকক্ষেত্রেই "ষ"কে "পেটকাটা", "শ"কে "উঁচু তালগাছে গোলগোল ফল", "ণ"কে "ল্যাম্পপোস্ট" ইত্যাদি বলে সহজ করে বোঝানোর চেষ্টা হয় | কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এসব বলার অভ্যাস ছাড়তে না পারলে কী হয়, সেটা দেখেছিলাম ক্লাস সিক্সে উঠে | আমাদের স্কুলে ক্লাস ফাইভ অবধি ছিল প্রাইমারী সেকশন, সকালে যেতে হতো | ক্লাস সিক্সই ডে সেকশনের প্রথম বছর | দিদিমণি ছেড়ে এবার স্যার | আমাদের বাংলার স্যার সুদীপ্তবাবু শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতীর স্নাতক, "অগ্নীশ্বর" সিনেমার উত্তমকুমারের মতো গম্ভীর | একবার ক্লাসে "শোষণ" বানান জিজ্ঞেস করেছিলেন | আমার এক ভীতু-ভীতু দেখতে সহপাঠী গত পাঁচ বছরের অভ্যাসমতো "উঁচু তালগাছে গোলগোল ফল ওকার পেটকাটা ল্যাম্পপোস্ট" বলতেই উনি চটে গিয়ে "ইয়ার্কি হচ্ছে? সাহস তো কম নয়!" বলে ওকে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন | তারপর থেকে আমরা কেউ আর জীবনে ওসব বলিনি |

ওই বছরেই বানান-সংক্রান্ত আরও একটা ঘটনা ঘটেছিলো যা ভোলার নয় | সুরজিৎ নামে আমাদের ক্লাসের একজন ছটফটে, অমনোযোগী ছাত্রের বানান নিয়ে যে চিরকালের সমস্যা, সেটা আমরা জানতাম | আমাদের মাস্টারমশাইরা তো তখনো জানেন না | ভূগোলের হাফইয়ার্লি পরীক্ষায় ও যথারীতি "নর্মদা"কে "নর্দমা", "তোর্সা"কে "তোস্তা" ইত্যাদি বানিয়ে রেখেছে যথেচ্ছ | ভূগোলের স্যার অবনীবাবু ভালোমানুষ, তিনি শুধু খুচরো কিছু নম্বর কেটেছেন ঐরকম ভুলের জন্য | কিন্তু গন্ডগোল বাঁধলো ইতিহাসে | ইতিহাস যাঁকে পড়াতে দেওয়া হয়েছিল তিনি আসলে উঁচু ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক | তার আগের বছর ইতিহাসের এক প্রবীণ শিক্ষক হঠাৎ অবসর নেওয়ায় কাজ চালানোর জন্য এই ব্যবস্থা | তা এই ভদ্রলোক তাঁর অনভ্যস্ত বিষয় পড়াতে গিয়ে সবসময়েই অস্বস্তিতে থাকতেন আর বোধকরি সেটা ঢাকা দেওয়ার জন্যই ছাত্রদের ওপর হম্বিতম্বিটা একটু বেশীই করতেন | যাইহোক, ব্যাবিলোনিয়ান সভ্যতা সিলেবাসে ছিল, পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে রাজা আসুরবানিপাল, নেবুচাডনেজার আর হামুরাবির ওপর | এবং সুরজিৎও স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বেশ কয়েক জায়গায় হামুরাবিকে লিখেছে "হামুরারি"| খুবই তুচ্ছ ভুল, আদৌ গুরুত্ব দেওয়ার মতো ব্যাপার নয় | কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমাদের সেই স্যারের নাম আবার মুরারি ভট্টাচার্য | অতএব জল কিছুদূর গড়ালো | সেই পরীক্ষায় অনেকেই ভালো করেনি, কিন্তু স্যারের পুরো

আক্রোশটা গিয়ে পড়লো সুরজিতের ওপর | ওর খাতায় কড়া মন্তব্য লিখে সেই খাতা বাড়ীতে বাবা-মাকে দিয়ে সই করিয়ে আনতে বললেন | শেষ অবধি ওর সেটা সাহসে না কুলোনোয় হেড্মাস্টারমশাইয়ের কাছেও নালিশ করেছিলেন উনি | অথচ এই ভদ্রলোকই পরে পদার্থবিজ্ঞান পড়ানোর সময় দেখতাম নিজেই মাঝেমাঝে বোর্ডে ভুল বানান লিখছেন | আসলে আমাদের বিজ্ঞানের পাঠ্যবইয়ে ছাপার দোষে সব "টো" গুলোকে "চৌ" মনে হতো | উনিও অক্ষরে অক্ষরে সেটাই মেনে চলতেন - এভাঞ্জেলিস্তা টোরিচেল্লি-কে চৌরিচেল্লি আর অটো ফন গেরিক-কে অচৌ ফন গেরিক লিখতেন |

ক্লাস সেভেনে উঠে অবশ্য আমরা এমন একজনকে পেলাম বাংলা পড়ানোর জন্য, যিনি সত্যিই একজন রসিক মানুষ | কথায় কথায় মজা করেন আর হাসান | ব্যাকরণটা উনি দারুণ পড়াতেন, আর বানান ঠিকঠাক মনে রাখার নানারকম চমৎকার উপায় বাতলাতেন | যেমন, আমার কোনো কোনো সহপাঠী তাদের নামের বানান "শুভাশীষ", "স্নেহাশীষ", "অরুণাশী" ইত্যাদি লেখে দেখে একদিন ওদের বললেন "ওরে, তোরা ধানের শীষ নোস্, পাখির শিস - এটা মনে রাখিস |" আর সেটা যাতে পাকাপাকিভাবে মনে থাকে, সেজন্য ওদের তারপর থেকে "শুভা whistle", "স্নেহা whistle" বলে ডাকতে আরম্ভ করলেন, যা বলাই বাহুল্য আমরা বাকিরা খুব উপভোগ করতাম | তা এই সুব্রতবাবু একবার গরমের ছুটির ঠিক আগে রচনা লিখতে দিলেন "তোমার প্রিয় একটি রবীন্দ্রসংগীত"| আমার এক বন্ধুর (যার রবীন্দ্রসংগীত-টঙ্গীতে মোটেই রুচি নেই, মুখে সবসময় হিন্দী সিনেমার গান) সম্ভবতঃ কয়েকদিন আগে স্কুলের রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রাইমারী সেকশনের এক দিদিমণির গাওয়া 'শাপমোচনের' দুএকটা গান ছাড়া আর কিছুই মনে নেই, তাই ও সেখান থেকেই একটা বাছলো | কিন্তু রবীন্দ্রনাথের "র"-ও জীবনে উল্টে না দেখলে যা হয় আরকি, দেখা গেলো "মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি"-র বদলে লিখেছে "মরবি না ওঠে কোন সুরে বাজি"| স্যার শুধু মুচকি হেসে খাতাখানা আমাদের সবার সামনে তুলে ধরে বললেন, "ভাগ্যিস 'বেঁচে থাকবি ওঠে কোন সুরে' লেখেনি |" এবং তারপরেই ওঁর অফুরন্ত মজারু গল্পের ঝুলি থেকে একটা গল্প শোনালেন | উনি যখন আমাদের মতো নীচু ক্লাসে পড়তেন আর ওঁর ভাই প্রাইমারী স্কুলে, একবার নাকি বিজ্ঞানের হোমওয়ার্কে প্রশ্ন ছিল স্বাস্থ্যদায়ক জড়িবুটি ও গাছপালা নিয়ে | উনি চিরতা গাছ নিয়ে লিখলেন, যা থেকে এক ধরণের তেতো ওষুধ তৈরী হয় | রাতে শুতে যাবার ঠিক আগে বই খুলে মেলাতে গিয়ে দেখেন চিরতার বদলে ভুল করে কালমেঘের (অন্য একরকম তেতো ওষধি) বর্ণনা লিখে ফেলেছেন | ঘুমজড়ানো চোখে ভাইকে বললেন ওই খাতায় যেখানে যেখানে 'চিরতা' লেখা আছে, রাবার দিয়ে মুছে 'কালমেঘ' করে দিতে | পরদিন সকালে খাতা খুলে দেখেন ওখানে বিজ্ঞানের হোমওয়ার্কের ঠিক পরেই যে বাংলা কবিতা মুখস্থ লিখতে দেওয়া ছিল, তাতে রবীন্দ্রনাথের "ওরা অকারণে চঞ্চল" কবিতার "চির তাপসিনী ধরণীর ওরা শ্যামশিখা হোমানল" লাইনটাতেও ভাই 'চিরতা' মুছে 'কালমেঘ' করে দিয়েছে!

বাংলা ভাষায় বানান ভুল মানেই কিন্তু শুধু "আকাঙ্ক্ষা" বা "পুঙ্খানুপুঙ্খ" লিখতে গিয়ে অসহায় আত্মসমর্পণ নয় | কোন শব্দের বানানে 'ন' হবে আর কোথায় 'ণ', অথবা স-শ-ষ এই তিনটের মধ্যে কোনটা কখন ঠিক, সে বিষয়েও বিভ্রান্তি কম নয় | ব্যাকরণ বইয়ে "ণত্ববিধান" আর "ষত্ববিধান" বলে দুটো অধ্যায় থাকে | ব্যাকরণের 'ব্যা'ও যারা কোনোদিন ছুঁয়ে দেখেনি তাদের কথা আলাদা, কিন্তু যারা ওদুটো একটু আধটু পড়েছে তাদের অতটা হিমশিম খাওয়ার কথা নয় | অন্ততঃ "স্যামবাজারের সসীবাবু" বা "শশাগরা পৃথিবী" ধরনের ভুল তাদের হবে না, যদিও "সর্বশেষ" বা "সংশ্লেষ" লিখতে গিয়ে তারাও হোঁচট খেতে পারে | 'র', 'ড়' আর 'ঢ়'-র জন্য ঐরকম কোনো অধ্যায় না থাকলেও মানুষের উচ্চারণ শুনে প্রথমটা আর পরের দুটোর মধ্যে তফাৎ করা যায় (অবশ্য 'ড়' আর 'ঢ়'-এর ফারাক বোঝানোর মতো শুদ্ধ উচ্চারণ খুব কম লোকেরই আছে)| তবু 'র', 'ড়' আর 'ঢ়'-এর গন্ডগোল-জনিত মজার অভিজ্ঞতা বোধহয় আমাদের সবার জীবনেই হয়েছে | মনে আছে অনেক ছোটবেলায় একবার আমার দিদিমার নির্দেশে তাঁর জবানীতে আমার বীরভূম-নিবাসী বড়মাসীকে চিঠি লিখেছিলাম তখনকার দিনের সেই একচিলতে ঘিয়ে-ঘিয়ে রঙের পোস্টকার্ডে | তাতে আমার মামা তাঁর বাড়ী থেকে ট্যাক্সি পেতে দেরী হওয়ায় দেরী করে বেরিয়ে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন মিস করেছেন সেই খবরটা দিতে গিয়ে লিখেছিলাম "মামা পড়ে গেছে তাই ট্রেন ধরতে পারেনি" | বলাই বাহুল্য কথাটা "পরে" হবে, "পড়ে" নয় | সেই চিঠি পেয়ে মাসীর বাড়ী থেকে উদ্বিগ্ন টেলিগ্রাম এসেছিলো কোথায় লেগেছে, হাড়গোড় ভেঙেছে কিনা জানতে | এর উল্টো গল্পটা শুনেছিলাম আমার এক মাসতুতো দাদার কাছে | হাইস্কুলে নীচু ক্লাসে ওর এক চূড়ান্ত ফাঁকিবাজ সহপাঠী নাকি

একবার পরীক্ষায় সাদা খাতা জমা দেয়, তাতে শুধু লেখা "স্যার, আমি আজ কিছু না পরেই পরীক্ষা দিতে এসেছি, কাল আমার দাদু মোড়ে গেছেন।" ঐ খাতা পেয়ে 'স্যারের' প্রতিক্রিয়া কী হয়েছিল, সেই কৌতূহল আমার আজও যায়নি। আমি প্রাইমারী স্কুলে পড়ার সময় দেখতাম পাড়ার কচিকাঁচারা বিকেলে লুকোচুরি খেলার সময় দরজা খোলা পেয়ে আমাদের পাশের বাড়ীতে ঢুকে খাটের তলায় বা আলমারীর পিছনে লুকোলেই ওই বাড়ীতে যিনি কাজ করতেন তিনি উচ্চৈঃস্বরে "এই, বেড়িয়ে আয়, বেড়িয়ে আয়, সন্ধ্যেবেলা অন্ধকারে খুব মশা কামরায়" বলে চেঁচাতেন। বোঝাই যাচ্ছে আসলে কী বলতে চাইতেন। এখনও প্রায়ই অনেককে লিখতে দেখি "অমুকে এখন বেরাতে বেড়িয়েছেন"। এই প্রসঙ্গ শেষ করি একটা স্বীকারোক্তি দিয়ে। আমিও ছোটবেলায় যখন প্রাইমারী স্কুলের গানের দিদিমণি 'তাসের দেশের' সেই বহুশ্রুত রবীন্দ্রসংগীতটি প্রথম তুলিয়েছিলেন, গানের খাতায় লিখেছিলাম "খড় বায়ু বয় বেগে"। একে তো ব্যঞ্জনবর্ণের এই গোলকধাঁধায় মানুষ নাজেহাল, তার ওপর আবার আছে স্বরবর্ণের ফাঁদ। একেবারে বিতত বিতংস। এবং পরিস্থিতি আরো জটিল করে দিয়েছেন জোড়াসাঁকোর নোবেল লরিয়েট। আমরা সেই কোন ছোটবেলা থেকে 'দেরি', 'ভারি', 'তরকারি' এসব লিখলে খাতায় ঘ্যাঁচঘ্যাঁচ লালকালির দাগ আর পিঠে স্কেলের বাড়ির দাগ পেয়ে পেয়ে 'দীর্ঘ ঈ'-র মাহাত্ম্য বুঝতে শিখেছি, আর উনি কিনা 'সহজপাঠে' এইসব বানানে হ্রস্ব-ই লিখে দিব্যি পার পেয়ে যান! 'ভারি' অন্যায় তো'! জানি না, আমাদের মতো ওঁরও হয়তো "বিভীষিকা"কে বিভীষিকা মনে হতো বা "মরীচিকা"র ভুলের ফাঁদে উনিও বারবার জড়িয়েছেন। তারই শোধ তুলেছেন 'সহজপাঠে'। কিন্তু একা রামে রক্ষা নেই, সঙ্গে সুগ্রীব দোসর – 'হ্রস্ব উ' আর 'দীর্ঘ উ'। সত্যি কথা বলুন তো, "মুমূর্ষু" আর "শুশ্রূষা" বানানে হ্রস্ব-উ আর দীর্ঘ-উ ঠিকঠাক মনে রাখতে গিয়ে আপনি কি কখনো মুমূর্ষু হয়ে পড়েছিলেন বা আপনার শুশ্রূষা দরকার হয়েছিল? হলে অবাক হবো না। "মুহূর্ত" আর "মুহুর্মুহু" নিয়েও হয়তো মাঝেমধ্যে ধাঁধায় পড়তে হয়েছে। পাড়ায় দুর্গাপুজোর চাঁদা চাইতে গিয়ে বড়দের কাছে কখনো না কখনো নিশ্চয়ই শুনতে হয়েছে "একী? চাঁদার বিলবইয়ে 'দূর্গা' লেখা কেন? আগে বানান ঠিক কর তারপর চাঁদা পাবি"। আর "ভুল"কে "ভূল" লেখার জন্যও হয়তো হাস্যাস্পদ হতে হয়েছে এক বা একাধিকবার। এসব ভাবলে যদি বিরক্তিতে বলে উঠতে ইচ্ছে করে "দূর ছাই! কোন দুঃখে বাংলা মিডিয়ামে পড়তে গিয়েছিলাম? ইংরেজী কত ঝামেলাহীন", তাহলে এমনিতে আপত্তি নেই, কিন্তু "দূর"-এ দীর্ঘ উ আর "দুঃখে" হ্রস্ব উ - সেটা যেন খেয়াল থাকে। নাহলে অদূর ভবিষ্যতে দুঃখ পেতে হতে পারে। মনে আছে তো বিদ্যাসাগরের সেই গল্পটা - একজন কী একটা সমস্যায় পড়ে তাঁকে চিঠি লিখেছিল "আমার খুব দুরাবস্থা" আর তিনি উত্তরে লিখেছিলেন "সেটা আপনার 'আকার' দেখেই বোঝা যাচ্ছে"। অর্থাৎ "দুরবস্থা"কে "দুরাবস্থা" লেখার জন্য বিদ্যাসাগরীয় ভঙ্গীতে একটু বকুনি আর কি! অবশ্য দুর্ভাগ্যক্রমে এমন শব্দও আছে যাদের লিখিত আকার না দেখলে শুধু উচ্চারণ শুনে বোঝার উপায় নেই যে তাদের আসলে কোনো 'আকার' নেই। কাজেই শ্রুতিলিখনের সময় ওগুলোর সঠিক বানান লিখতে "ব্যর্থ" হলে সেই "ব্যথা" উপশমের "ব্যবস্থা" আপনাকেই করে রাখতে হবে। অ-কার আর ও-কারের মধ্যে গুলিয়ে ফেলাটাও খুব স্বাভাবিক, বিশেষতঃ আমাদের যখন অনেক অ-কারান্ত শব্দকেই "ও"-এর মতো উচ্চারণ করার রীতি। আমাদের উচ্চারণ নিয়ে আমার এক হিন্দীভাষী বন্ধু একবার ঠাট্টা করে বলেছিল, "তোরা সবসময় মুখে রসগোল্লা নিয়ে কথা বলিস"। তবে একদা পশ্চিমবঙ্গের এক ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের স্বাক্ষরতা অভিযান নিয়ে কলকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে যে মাঝেমাঝেই লেখা থাকত "চলো পোড়াই, কিছু করে দেখাই", সেটা খুব সম্ভবতঃ ওই কারণে নয়। যারা ওগুলো লিখতো তারা নিজেরা ছোটবেলা থেকে পড়াশোনার বদলে "পোড়াশোনা" করেছে হয়তো - তাই ওই হাল। আমার ছোটবেলায় যখন খবরের কাগজে পড়তাম "অসমে বড়োদের আন্দোলন ও বিক্ষোভ", মনে মনে ভাবতাম ওই রাজ্যে বড়দের বুঝি ছোটদের মতোই কড়া শাসনে রাখা হয়, কলকাতায় আমার দেখা বড়দের মতো যা খুশী তাই করতে পারে না তারা - তাই এতো রাগ। তখন তো আর জানতাম না "বড়ো" (যাদের অনেকসময় "বোড়ো"ও লেখা হয়) অসমের একটা জনগোষ্ঠীর নাম। আমার এক খুড়তুতো বোন কচিবয়সে প্রথম যখন রবীন্দ্রসংগীত শিখতে শুরু করে, "আমার পরাণ যাহা চায়" বা "আমি চঞ্চল হে"কে কিছুতেই প্রথা মেনে "আমারো পরানো যাহা চায়" বা "আমি চঞ্চলো হে" এভাবে গাইতে চাইতো না, বলতো হলুদ মলাটের বইটায় (মানে গীতবিতানে) তো ওরকম লেখা নেই। ওই বোনই একবার পাড়ার রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করেছিল "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে/ জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৈরভ রভসে/ ঘনগৈরবে নব জৈবনা বরষা" ইত্যাদি।

শব্দগুলোর মানে জানলে ও হয়তো বুঝতো যে এই লাইনকটায় কবির আসল উদ্দেশ্য 'ঐ'-এর অনুপ্রাস তৈরী করা নয়। এ-কার নিয়েও মাঝেমাঝে মজার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । আমাদের কলেজের হোস্টেলে আমরাই পালা করে মেস-ম্যানেজার হতাম, অর্থাৎ এক-এক মাসে এক-একজন মাসকাবারি আর দৈনিক বাজারের হিসেবে রাখতাম। সে-বাজার আমাদের করতে হতো না, একজন লোক এসে দিয়ে যেত। শুধু সপ্তাহে যেকদিন মাছমাংস হতো, ম্যানেজারের নির্দেশ অনুযায়ী তার কাছ থেকে টাকা নিয়ে অন্য কোনো একজন ছাত্র সেটা এনে দিতো দোকান থেকে সকালবেলা। একদিন কী একটা উপলক্ষ্যে আমাদের বিশেষ খাওয়াদাওয়া - যাকে বলে গ্র্যান্ড ডিনার। সেদিন চুনো মাছ আনার কথা নয়, কিন্তু যে নবাগত অনভিজ্ঞ ছেলেটির ওপর দায়িত্ব পড়েছিল সে ভুল করে ট্যাংরা আর বাটামাছ এনে রেখে গেছে রান্নাঘরে। রাঁধুনীদের কাছে খবর পেয়ে ম্যানেজার ছেলেটির ঘরে ঢুকে (সে তখন ঘরে ছিল না, বাথরুমে ছিল) টেবিলে একটা চিরকুট রাখলো "আজ তো স্পেশ্যাল রান্না, ছোট মাছ কেন"। স্নান-টান সেরে ঘরে এসে ওই চিরকুট পেয়ে বেচারা আবার তড়িঘড়ি বাজারে ছুটলো, এবার নিয়ে এলো মৌরলা! ছেলেটাকে দোষ দেওয়া যায় না, ও বুঝবে কী করে যে ম্যানেজার আসলে কৈফিয়ত চেয়েছে, আবার কিনতে যেতে বলেনি? আর ম্যানেজারকেও কি অভিযুক্ত করা ঠিক হবে "ক্যানো?" না লিখে "কেন" লেখার জন্য? আমরা তো ওরকমই লিখি।

সব স্বরবর্ণকে ধরে ধরে খলনায়ক বানালাম, ঋ-কারই বা বাদ যায় কেন? আমার হাইস্কুলের এক সহপাঠীর দৌলতে স্মরণীয় হয়ে আছে এই ঋ-কার। একবার কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের "হাট" কবিতাটির সেই বিখ্যাত পংক্তি "বিকালবেলায় বিকায় হেলায় সহিয়া নীরব ব্যথা"র তাৎপর্য্য লিখতে গিয়ে ও বোধহয় "অবিক্রীত পণ্য"র বদলে লিখেছিলো "অবিকৃত পণ্য"। তাতে বাংলার টিচার যে নম্বর কেটেছিলেন, সেটা নিশ্চয়ই ওর মনে বেশ ভালোরকম দাগ কেটে থাকবে। কারণ তারপর ও জীবনবিজ্ঞানে "যকৃৎ"কে "যক্রীত" আর "কৃমি"কে "ক্রীমি" লেখা শুরু করলো। ওর বানানের বহর দেখে আমাদের জীবনবিজ্ঞানের টিচার ওকে ইংরেজীতে পরীক্ষা দেওয়ার পরামর্শ দিলেন (আমাদের বাংলা-মাধ্যম স্কুল হলেও বিজ্ঞানের বিষয়গুলো বোর্ডের পরীক্ষায় দুটো ভাষাতেই দেওয়া যেত), কিন্তু তাতে আবার উল্টো বিপত্তি। এবার শুনলাম ও জীবন্ত জীবাশ্মকে living fossil না লিখে alive fossil আর heart muscle-কে hurt mussel লিখেছে।

তাহলে শেষমেষ কী দাঁড়ালো? দাঁড়ালো এটাই যে, 'বানান ভুল' জিনিসটা অনেক লাঞ্ছনা, পিটুনি, উপহাস-পরিহাস আর বিড়ম্বনার স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকলেও দিনের শেষে ওটা আমাদের জীবনে এক অফুরন্ত মজার উৎস। ভাবুন তো - বাংলা সাহিত্যে সব মজারুর সেরা মজারু সুকুমার রায়ের সেই অনবদ্য 'খিচুড়ি' পানসে হয়ে যেতো না বানান ভুল না থাকলে? তার প্রথম লাইনটাই যে "হাঁস ছিল সজারু, ব্যাকারণ মানি না ···"

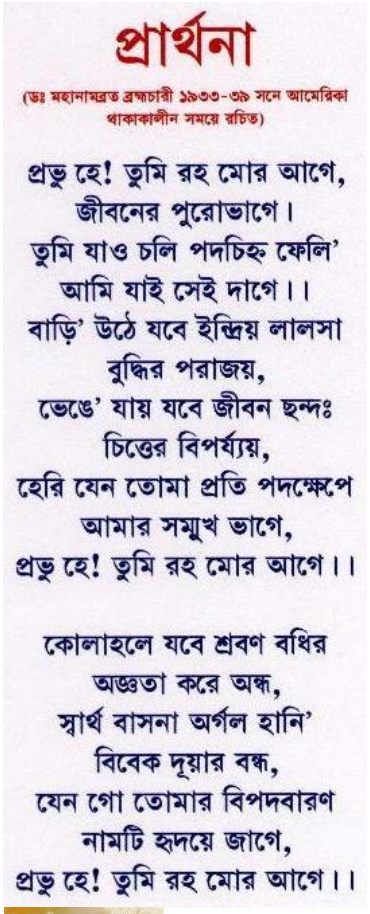

কোনও এক রাত্রির শ্রাবণে

উদ্দালক ভরদ্বাজ

সব ঘটনারই একটা মূল্য আছে|
বহমান জীবনের ভিড়,
প্রত্যেক মুহূর্ত কিছু বলে চলেছে;
সময়ের দ্রুততায় তাকে চিনে নেওয়া -
হয় না সময় করে|
তবু কিছু রাত্রির সকাশ,
অপ্রয়োজনীয় সাক্ষাৎ -
বলে যায় কানে কানে
অন্য কথা|

সে বলেছে আর কিছু...
প্রতিভাত, হৃদয়ের নিবিড় নিভৃতে
অন্য মানে দানা বাঁধে|
সে এসে দাঁড়ায়,
যার আসার কথা ছিল আশ্বিনের রাতে|
সে এসে আশ্রয়-হাত
রেখে দেয় হাতে|
সজল চোখের আলো
মেলে ধরে অপূর্ব আলোকে,
স্নিগ্ধতা ডানায় তার,
"এতদিন আসনি কেন,
ছিলে যদি, দেখিনি কি করে এতদিন?"

চোখের দেখার পাশে
সেই দেখা, পড়ে থাকে,
একদিন জন্মান্ধ চোখ
অন্ধকারে দেখে নেবে বলে|
ফুলের আঙ্গিকে মন
মনের নিবিড়ে নীড়
বেঁধে ওঠে আপনিই,
স্বপ্নের বাসা|

না-ফোটা, অস্ফুট-আলো
ছায়া-ভাঙা ভোরের মতন -
সেই নৌকো একদিন
হৃদয়ের স্থির জলে ছায়া ফেলে|
বৈতরণী স্পষ্ট দেখা যায়|
শান্তির বসতি, হৃদয় নদীর পারে -
আবেগ-বাতাস রহিত
নিখুঁত অরণ্য
খুঁজে নেয় ফুল্ল চরণ তার;
সেই মায়া, ফুল এনে দেয়
সেই ভুল, মায়ার মতন
একদিন দেখায় পথ
সঠিক, সুস্থির|

কেয়াফুলে মন পড়ে থাকে
কেয়াফুল পড়ে থাকে মনে,
তবু এই রাত্রির শ্রাবণে...

দেয়ানেয়া

মিশা চক্রবর্তী

দিতে আসা হাতগুলো চিনে নিতে হয়!
নেয়ার ভিড়ের মাঝে আলাদা তারা -
চাওয়া পাওয়া বড় দায়, অবুঝ এ মন হায়,
কিছু হাত ধরে ফেলে আজ দিশেহারা!

কেউ দিল নীরবতা, কেউ দিল কথা
কেউ শুধু দিল ঝড়, আশাতীত ব্যথা|
কেউ হাতে হাত রেখে কোলাহল খোঁজে -
কারোর লুকানো আশা শুধু মন বোঝে|

পাশাপাশি থাকা হাত সমান্তরাল
তুলি রং দেয়া হাত আজ এত একা!
বাড়ানো দুহাত, মাঝে ধারালো দেয়াল -
ছোট ছোট দুইহাতে নিজেকে দেখা!

Greta Thunberg-এর মনের কথা

সুজয় দত্ত

[সুইডেনের মেয়ে Greta Thunberg আজ সারা পৃথিবীর কাছে একটা জ্বলন্ত প্রতীক। বাবা-মার স্নেহের আশ্রয় ছেড়ে, স্কুলের পড়া স্থগিত রেখে এই ষোড়শী এখন তার প্রতিবাদী কণ্ঠ নিয়ে দুনিয়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে উষ্ণায়ন - অবিশ্বাসীদের প্রতি, আর ওর নিজের এবং আগামী দিনের সব প্রজন্মের তরফ থেকে এই দ্বিধান্বিত বিশ্বের সুপ্ত চেতনার কাছে কাতর আবেদন জানিয়ে চলেছে - জাগো, তোমরা জাগো, সর্বনাশ শিয়রে। আচ্ছা, মেয়েটি যদি বাংলা জানত, কী বলত সে?]

মাসী গো মাসী পাচ্ছে হাসি, এই মানুষের রকমসকম
যতই দেখি ঘোর লেগে যায় - জীব বটে এক আজব রকম।
যে গাছেতে বসে আছে তারই দেখো কাটছে ডাল,
নিজেই নিজের খুঁড়ছে কবর, আনতে কুমীর কাটছে খাল।
এক নৌকায় সাতশো কোটি,
আর তো কোথাও নেইকো যাবার -

সেই গ্রহেরই গাছপালা-জল-বাতাস-মাটি করছে সাবাড়।
অন্ধ লোভে ছড়াচ্ছে বিষ, তেল পুড়িয়ে করছে গরম
এই পৃথিবীর আবহাওয়াটা, বুঝছে না কী ভুলটা চরম।
বেঁচে থাকার রসদ নিয়ে ব্যবসা ঢালাও দুনিয়া জুড়ে -
'মুনাফা' নাম জপছে সবাই, ন্যায়নীতিবোধ ফেলছে ছুঁড়ে।
হবই আমি কোটিপতি, আধ-পৃথিবী দূরের কারো
সর্বনাশটি হয় যদি হোক - বয়েই গেল, ওসব ছাড়ো!

সমস্যা এই - জগতে ভাই মানুষ আছে নানান ধরন।
চামড়া তাদের সাদা, কালো, বাদামী আর হলুদ বরণ।
সাদারা কয় "করলে দূষণ, পরিষ্কারও করছি মোরা,
দায়িত্বটা সবার ওপর - কাঠ, ঘুঁটে আর কয়লা পোড়া
তোরাও কমা, গরজ দেখা, দোষ দিয়ে ভাই যাস না ফুটে।"
বাকীরা কয় "বেশ তো মজা! চিরটাকাল লুটেপুটে
খেয়ে এখন দিচ্ছ বাণী? বুকনি থামাও, মাল্লু ছাড়ো।"
এমনি করে তরজা চলে, শুনবে কথা কেউ কি কারো?

এদিকে আজ ফুলছে সাগর, ডুবছে যে দ্বীপ, আসছে বান,
মুহুর্মুহু ঘূর্ণিঝড়ে ভাঙছে শহর, যাচ্ছে প্রাণ।
বড়রা তাও বলতে পারো, "এমনি করেই যাক না দিন।
কেটেই গেল জীবন যখন, থাকতে যে চাই ভাবনাহীন।"
আমরা বুঝি ফেলনা তবে? স্কুল এখনো পেরোইনি,
বুঝতে খানিক সময় গেল, তাই এতদিন বেরোইনি
পথে পথে মিছিল নিয়ে - এখন তো আর ছাড়ব না!
পাহাড় সমান জেদ আমাদের, বাধার কাছে হারব না।
ধ্বংস করে দুনিয়াটাকে যে-যার মতো পড়বে কেটে,
আমরা জীবনভর তোমাদের পাপের সে-পাঁক মরব ঘেঁটে?
আমরা ছোট, কিন্তু জেনো চেতনা আর বুদ্ধিতে
এগিয়ে আছি অনেক যোজন । এই পৃথিবীর শুদ্ধিতে
ভাঙব যত গোঁড়ামি আর স্বার্থপরের ভণ্ডামি,
গড়ব মোরা বিশ্ব নতুন - জানিয়ে গেলাম আজ আমি।

Greta Thunberg

প্রবাস বন্ধু

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

আমরা সবাই প্রবাস সাগরে
সাহিত্যের এক বিন্দু,
সেই বিন্দু সবাইমিলে
গড়ল 'প্রবাস বন্ধু'|

বন্ধু তারাই হয় যেখানে
না বলে যায় পাওয়া
গেলেই শুধু মিলবে সেথায়
পেটটি পুরে খাওয়া!

খাওয়া হলেই সব হ'ল না
লেখা পড়াও চাই,
নাহলে সব শুনতে হবে
সাহিত্য সভার দায়|

'দায়' নিয়ে সে না হয় যেন
'দায়সারা' বা তেমনি,
মন-প্রাণ সব থাকে যেন তাই
'নিজের বেলায়' যেমনি|

যেমনি আসা তেমনি যাওয়া
চলবে না যা খুশি,
শুনতে হবে, বলতে হবে
সভার মাঝে বসি|

বসি বসি করে কখন
সময় হবে পার,
পার থেকে আরপারে যাওয়া
সেই তো জীবনসার!

জীবনসার আর চলা নিয়ে
যখন ভাবি ভাবব,
অজান্তে কোন কাজের নেশায়
অক্কা পেল কাব্য!

কাব্য গেলেও আসবে ফিরে
নদীর যেমন সিন্ধু,
আমরা তেমন এক হয়ে রই
ধন্য 'প্রবাস বন্ধু'!

অমোঘ সত্যি হয়তো

সুজাতা দাস

যদি চাই মুক্তি;
জীবনচক্র হতে -
দিবি সে অঞ্জলি আমার হাত ভরে?
এ চাওয়াই হয়তো শেষ চাওয়া -
জীবনের মূল্যায়ন হয়তো হবে না -
হবে না দেওয়া কথাগুলো আর রাখা -
হয়তো থেমে যাবে পথ চলা এখানেই -
ফেরা হবে না হয়তো শুরুতে চলা -
কেমন যেন আজ মন খারাপের সকাল -
চাইছে মন তোকে জড়াতে ভীষণ -
বেঁধে রাখার ক্ষমতা কী তোর আছে?
নাকি শূন্যে ভাসাব এই জীবন -
একলা চলা পথে হয়তো মনে পড়বি তুই -
হয়তো মোচড়ানো মনটা ব্যথায় কাঁদবে -
মনে পড়বে সেই একাত্ম হওয়ার গল্প -
হয়তো বিসর্জিত করব সব বৈতরণীতে -
তবুও খুঁজে ফেরে মন অসময়ে -
হয়তো তোকে খুঁজব -
কোনও বিবশ রাতের বিকল্প ব্যাখ্যান মনে করে -
নতুন করে রূপকথার গল্প হয়তো রচনা হবে -
তখনও তুই থাকবি আমার মনে -
যেখানে তুইই স্পর্শ করবার সাহস রাখিস|

পরবাসী

নমিতা রায়চৌধুরী

এক একটা দিন শুরু হয়
ভালবাসার গা ছুঁয়ে|
নীলরঙে লেগে রয় খানিক হলদে আভা|

রবি ভালবেসে ছুঁয়ে যায় আকাশ,
আকাশ ছুঁয়ে দেয় জল,
লাল রঙ ব্রীজ পেরিয়ে নদী
ছুঁয়ে যায় সবুজের সুখ|
সরিষা মাঠে খেলে গা-দোলানো
কিশোরী হলদে হাওয়া|

সোনার কাঁকন রেখে যায়
শান-বাঁধানো ঘাটে,
স্মৃতির সোনালী - রুপোলী ঢেউ|
ঘাসজমি আঁচলে বাঁধে সে কথা|
স্মৃতির পানসি সেদিন নোঙর ফেলে
বাউল যেথায় বেঁধেছে বাসা|

স্বপ্নের ঘুড়ি উড়ে এভাবেই,
ছুঁয়ে দেখে বাবুই পাখিটির ঘর|
নদীও নিরিবিলিতে হেসে কথা কয়,
তবুও মাঝির বুকে লুকিয়ে কাঁদে
নীলের বিয়োগ ব্যথা|

এভাবেই স্মৃতির বুকে রাখি হাত
পরদেশী মেঘ হয়ে|
মাটির ভেতরেও মাটি খুঁজি,
মন খোঁজে চেনা মাটির
সোঁদা গন্ধ বৃষ্টি-ভেজা|

যখন বৃষ্টি আসে

আলী তারেক

যখন বৃষ্টি আসে -
যেন পৃথিবী হাসে|

যখন বৃষ্টি আসে -
যখন ফোঁটাগুলি এখনো এসে পড়েনি
যখন মিলন প্রত্যাশায় ছোটা রক্তের আওয়াজের মতো
একটা শান্ত গুঞ্জন ভিড় করে দাঁড়ায় দিগন্তের কাছে
যখন রাস্তায়, ছাদে, গাছে, গাড়ির উপরে
পৃথক বর্ষাবিন্দুর টুপটাপ ধ্বনি মূর্ত হয়ে ওঠেনি -
ধূসর আকাশের প্রেক্ষাপটে একটা পাতা
অগণিত সহবৃক্ষীর কথা ভুলে
তার ভারাক্রান্ত সবুজ পটে ধুলোট আস্তরণ
ধুয়ে নেবার আকাঙ্ক্ষায় অস্থির|

যখন বৃষ্টি আসে -
যখন স্বর্গলোভী দালানগুলো ব্যাবেল টাওয়ারের মতো
তোমাকে ছোঁয়ার আশা ত্যাগে উদ্যত,
তখন অবেলায় কুয়াশার মতো
বৃষ্টিঝাপ নিজেই নেমে আসে বিহ্বল শিখর ছেয়ে|
তখন দূরে কোথাও,
যেখানে পৃথক বর্ষাবিন্দুর টুপটাপ ধ্বনি মূর্ত হয়ে ওঠেনি -
তখন ঝরেপড়া ছিন্নপক্ষ কোনো বিহগের মনে
অসময়ে বেহাগের অবর্ণনীয় রঙ
তার বিরহাতুর পালক বাদলের রোমাঞ্চ তৃষ্ণায় মুহ্যমান|

যখন বৃষ্টি আসে -
যখন মানস সরসীতে অকস্মাৎ নির্ঝরের
মাটি ছুঁয়ে আসা অনুরাগ রসের আশ্বাস শুধু
অথচ পৃথক বর্ষাবিন্দুর টুপটাপ ধ্বনি মূর্ত হয়ে ওঠেনি -
তখনই কেন অন্তরপটের মেঘশূন্য আকাশে ঝরে -
ঝরে অব্যক্ত বেদনার হাহাকার হয়ে
নির্জল অশ্রুর মতো ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি?

গোলকমঙ্গল কথা

কৃষ্ণকুমার শর্মা

গণভৌতিক নির্বাচনে লক্ষ কোটির মেলায়
সর্বোপরি ভোট পেল এক মহারাজ বারবেলায়।
সরব মিছিল, গণবিক্ষোভ ব্যর্থ হ'ল শেষে,
অনাসৃষ্টি কান্ড এমন ঘটেনি এই দেশে।
দেশের ভাগ্যচক্রের একী খামখেয়ালি খেলা!

মহারাজ ক'ন আভিজাত্যের অর্ধ কণ্ঠ হেসে,
"দেশের যাবৎ নিয়মকানুন শিকেয় উঠুক এসে।
রাজ্যের যত কর্মচারী নির্বোধ আর মন্দ,
ধরন-ধারণ দেখে তাদের হতেছে মোর সন্দ।
আজ হতে রাজকর্মের দায় নিলেম আমি শেষে।"

প্রাসাদ কক্ষে রাজদরবারে মহারাজ সদাসীন,
মুখ্যমন্ত্রী দাঁড়ালেন আসি তাঁহার আজ্ঞাধীন।
রাজা কহিলেন "দক্ষিণ দেশে সংবাদ সমাচার
আমার কেশের পীতবর্ণের করে শুনি কুপ্রচার।
মহা অভিযানে করো সেই দেশ ধূলি'পরে বিলীন।"

রাজ-আজ্ঞায় মুখ্যমন্ত্রী পড়েন সমস্যায়
মহারাজের কঠিন আদেশ পালন করাই দায়।
সাগর পারের কোন দেশের এক দুঃসাহসী সাংবাদিক
মেলে না সেই দেশের হদিশ ভূখণ্ডের কোনও দিক।
সেই সংবাদ রাজারে আজ পেশ করেন কী উপায়ে!

চিন্তাগ্রস্ত মন্ত্রীমহল, আমলাদের চারদিন
অন্নগ্রহণে নাই অবসর, দুচোখ নিদ্রাহীন।
চতুর্থ রাতে সাড়া গেল পড়ে - দুশ্চিন্তার অবসান,
আমলামহল করেছে ঘোষণা সমস্যার সমাধান!
রাজদরবারে বুঝতে তত্ত্ব যাবেন মন্ত্রী পরদিন।

রাজ্যমধ্যে পঞ্চমদিনে আপামরজনে হর্ষিত
ভারী সমস্যার দ্রুত সমাধান স্বপ্নেও কেউ ভাবেনি তো।
প্রভাতের আলো ফুটিতে না ফুটিতে তুরী ভেরী ওঠে বাজিয়া
মুখ্যমন্ত্রী উঠিলেন রথে কপালে তিলক কাটিয়া।
পথে প্রান্তরে জয়ধ্বনি তাঁর শির'পরে হ'ল বর্ধিত।

বেলা দ্বিপ্রহরে মুখ্যমন্ত্রী ভূগোলক এক আনিয়া
রাজ-পাদপ্রান্তে বিজয় গর্বে রাখিলেন মৃদু হাসিয়া।
শুধালে নৃপতি "সংবাদ কহো, দক্ষিণে কবে অভিযান?
শীঘ্রই কিছু ব্যবস্থা করো, নতুবা থাকে না মান।"
মুখ্যমন্ত্রী ভূগোলক কথা শুরু করিলেন মৃদু কাশিয়া।

"হে রাজাধিরাজ, দক্ষিণপানে দেশের সাগর পারে,
কোনও দেশ কভু ছিল না কোথাও, কোনও দ্বীপ জল'পরে।
তোমার রাজ্যে ভূবিদদিগের দৃষ্টি এতই তীক্ষ্ণ,
তাদের সহায়ে কাটায়েছি মোরা দখিন দেশের বিঘ্ন।
দখিন সাগরে পেয়েছি সে দেশ যোজন দশেক দূরে।"

কহেন মন্ত্রী "ভূগোলক এক দেবতাদত্ত ফল,
এ গোলক বিনা দক্ষিণদেশ খোঁজা হত নিষ্ফল।
গুরুতর বহু সমস্যাভারে পৃথিবী চিন্তাগ্রস্ত,
সেই কারণেই সম্মুখপানে হয়েছে সে ন্যুব্জ-নত।
গোলকের 'পরে পৃথিবী মোদের একান্ত সম্বল।

নত পৃথিবীরে ভূগোলক'পরে ধরি যদি করে সোজা,
গোলকধাঁধায় মিলে যাবে পথ, শেষ হবে দেশ খোঁজা।
পৃথিবীর এই অক্ষদন্ড সোজা হবে মৃদু চাপনে,
নৈঋত দিক যাবে দক্ষিণে, আর দক্ষিণ অগ্নিপানে।
দখিন সাগরে সে দেশ তখন দেখিবেন মহারাজা।"

শুনি ব্যাখ্যান মহারাজ হ'ন বিস্ময়ে হতবাক,
মন্ত্রীরে ক'ন "অক্ষচাপন আপাতত চাপা থাক।
স্থগিত থাকুক দক্ষিণ দেশে সেই মহা অভিযান,
স্থির করিলাম সর্বাগ্রে দিব তোমারেই সম্মান।
তোমার যোগ্য ধন নাই কোষে, শুধু আছে খেতাব।

আজ হতে কবে জনগণ সবে তুমি এক দিকপাল,
বিদ্যা অথবা বুদ্ধিতে কোনও জন এ জগতে বিরল।
তোমা হেন এক মুখ্যমন্ত্রী জগতে কোথায় আছে?
আজ হতে তুমি মহামন্ত্রী, চিরকাল রহো কাছে।"
শুনিয়া ঘোষণা জয়ধ্বনি রবে সভা হ'ল উতরোল।

হেরো সত্যের হ'ল মহাজয়
শান্তির হ'ল চির প্রতিষ্ঠা, অশান্তির পরাজয়।
সর্বতোগুণী মহামন্ত্রীর সম্মান জনমনে
এক লোষ্ট্রে তিনটি শিকার, হাসে শুধু দুর্জনে।
গোলকমঙ্গল কথা অমৃত সমান,
ভণে কৃষ্ণকুমার সুখে, শুনে পুণ্যবান।

অন্তরাগ

সফিক আহমেদ

শাওন,
অনেক না বলা কথাই তো জমা হয়ে আছে,
রচনা করতে পারি তোমাকে নিয়ে একটা
জয়দেবের "গীতগোবিন্দ"-র মতন প্রেমকাব্য।
আজও মনে পড়ে,
প্রথম দেখায় কথার শ্রাবণ
বানভাসি সেই কথার প্লাবন
ভাসিয়ে দিত কথার নদী
তৈরী হত গহীন সাগর
তোমার সৌন্দর্যের সুবাস করত আবিষ্ট।
হৃদয়, মস্তিষ্কের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে
জলতরঙ্গের সুরের মূর্চ্ছনায়
শুধু তোমার সুরই বাজত।
সজ্ঞানে অজ্ঞানে বিরাজ করতে শুধুই তুমি
কখনো উচ্চৈঃস্বরে প্রেম নিবেদন করিনি,
অনুচ্চারেই বলে গেছি অনেক কথা।
তোমার উজাড় করা বিন্দু বিন্দু প্রেমসুধায়,
কানায় কানায় পূর্ণ হয়েছিল হৃদয়কলস।
হারাবার ভয়ে উগ্র আগ্রাসনের
বেষ্টনীতে বাঁধতে গিয়ে
হারিয়ে ফেলেছিলাম তোমাকে।
অভিমানে আহত হয়ে সরে গিয়েছিলে তুমি।
বুঝিনি প্রেমের প্রজাপতি উড়ে যায়
জাপটে ধরতে গেলে।
তাকে বসতে দিতে হয় গায়ে।
যখন মনের ঘরে প্রশান্তি আসে
এমনিই বন্ধ হয়ে যায় ডানা ঝাপটানো।
সমর্পিত হয় কবোষ্ণ আলিঙ্গনে।

তারপর কেটে গেছে দীর্ঘ সময়,
কথার তো আর হয়নি প্রকাশ
অভিমানের মেঘ জমেছে
হাজার হাজার বছর ধরে
বছর বছর বরফ পড়ে
কত কথাই হারিয়ে গেছে
হিমবাহর বুকের নিচে
প্রকৃতি শূন্যতা পছন্দ করে না।
সময়ের ক্ষত ভরিয়ে দিয়েছে সময়।
আজ সূর্যাস্ত ঢেলে দিল এত রঙ,
মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম সাতরঙা রামধনু
আর ভাবছিলাম তোমারি কথা।
আজ জীবন সায়াহ্নে সাতরঙে রাঙা হয়েছিল আমার অন্তর।
তোমার অন্তরঙ্গ মুহূর্তের সঙ্গী হয়ে আরও অন্তরঙ্গ মনে হচ্ছিল
আজকের শেষ বিকেলের অন্তরাগ।
উষ্ম বুকের উষ্ণতাতে বাষ্পীভূত অশ্রুধারা যেমন হয়ে যায় মেঘ,
আবার সোহাগখাকি সোহাগ পেলে ফিরে আসে অঝোর ধারায়,
তেমনই সীমাহীন আবেগের সফেন ঢেউয়ে
ফিরে ফিরে আসছিল হারানো সুখস্মৃতিগুলো
হিমবাহের তুষার দেয়াল
জলের ওপর পড়ে ভেঙে
বুকভাঙা তার গভীর কথা
বেরিয়ে আসে ভাঙার পরে
টুকরো টুকরো জমা কথা
ভাসতে থাকে সাগর জলে
গহন মনে অনুরণিত হচ্ছিল,
শুধু একটাই অনুভব
তুমি একলা নয় শাওন,
আমিও পথ চেয়ে বসে আছি।

প্রবাস বন্ধু

রঙ্গনাথ

মাতৃভাষা বড় প্রিয়, অন্তরে তার স্থান
এ ভাষাতে বললে কথা জুড়ায় পরান।

প্রবাসে বাংলাভাষী পাওয়া দুষ্কর
সবাই ছড়িয়ে থাকে ভিন্ন মহল্লায় -
এ প্রবাস বন্ধুরা এক সাথে জমা হলে
খোলা মনে বাংলায় কথা বলা যায়।

লক্ষ্য হ'ল, সাহিত্য নিয়ে আলোচনা;
এর চেয়েও বেশী পাই বলে মনে হয় -
স্বরচিত, অন্যের লেখা থেকে পাঠ করা
হাসি-ঠাট্টা, পান-ভোজন থাকে নিশ্চয়।

অলিখিত নিয়ম, বড়-ছোট সবাই জানে -
ছোটরা থাকে ব্যস্ত বাড়ির এক কোণে;
বড়রা ব্যস্ত বাংলা চর্চায়, গল্প-আড্ডায়;
গানের আসরে সবাই মন দিয়ে শোনে।

সভাতে হতে নেই ধর্ম কথা, লঘুবাচ্য
পরনিন্দা, অবান্তর স্তুতি, রাজনীতি -
বন্ধুরা চায় না বিভক্তি, হানে মর্মাঘাত;
তারা রক্ষা করে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস-সম্প্রীতি।

হেথা প্রবাসবন্ধু সঙ্ঘ এক অমূল্য রতন -
এ থাকায় কাটাই দিন বাঙালির মতন।

{উৎসর্গ
প্রবাস বন্ধুর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয়
ডঃ অসিত কুমার সেনকে।}

উৎসব

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার আকাশ বুকে বাঁধে
পঞ্চমীর চাঁদের বহর, একফালি...
তারাদের ফুল ঝরতে ঝরতে
উপবাসী জাগে আগুনদীঘির জঠর,
স্নান সেরে উঠে আসে ঘুমপরীরা,
ভিজে কাঁচের ওপারে, আবছা আমার গ্রাম
সেখানে বাসা বাঁধছে উৎসবের পাখপাখালি

সাদা শাড়ীর লালপাড় বেয়ে
নেমেছে সারি সারি তালগাছের সৈন্য
গায়ের তাঁতে কৃষ্ণলীলার পট
আর তাজা মাড়ের সুপ্রাচীন ঘ্রাণ
কোনো এক ব্যথার বীজ
সরযূর পারে পারে গাঁথা

আলো ছুঁতে ছুঁতে মেনেছে হার
আমার ক্লান্ত দ্রাঘিমা,
বীজ ভেঙে অঙ্কুরিত তৃণ
এঁকেছে ভ্রান্ত অভিমুখ,
তবু পেরোলাম চৌকাঠ,
যেখানে অনাদিকাল থেকে চন্দনের ফোঁটা পরেছে, অলক্ষ্যে
এ প্রতীক্ষার অতীত জুড়ে রক্ষিত, আমার কবজ-কুন্ডল।

যাপন

রত্না ব্যানার্জী

ঊষালগ্ন ফিরে আসে নিশিশেষে
আধো আলো আধো আঁধার দুহাতে নিয়ে।
মায়ের টুকটুকে লাল টিপের মতো
আকাশের কপালে সূর্য টুপ করে দেখা দেয়।
শার্শি দিয়ে উঁকি দেয় নরম রোদ।
যেতে যেতে বিদায়ী চাঁদ সূর্যকে বলে যায় -
আমার কাজের শেষে শুরু হ'ল তোমার কাজ।'
সবাই যে যার কাজে চলে যায় বাড়িটাকে একা ফেলে।
সে দাঁড়িয়ে থাকে একা
সঙ্গী হয় পাখি, ফুল, আকাশ-বাতাস -
আর হয় বৃষ্টি-বাদল, মেঘবালিকার দল।
গ্রীষ্মের উত্তাপে বাড়িঘর উষ্ণ,
ঝড়ের হাওয়ায় ওড়ে পর্দাগুলো,
রিমঝিম ঘনঘন বৃষ্টিধারায় স্নাত সে বাড়ি
জ্যোৎস্নায় মাখামাখি করে রাখে ঋতুরাজ বসন্ত।

ঢং ঢং ঘড়ির আওয়াজের সাথে
সময় চলে সময়ের মতো, একটু না থমকে।
দিনাবসানে বাড়ি ভরে ওঠে আবার
বাচ্চাদের দাপাদাপিতে,
ভরে ওঠে খুনসুটি আর বায়নাতে।
কারো অনেক অভিযোগ পড়ে ঝরে,
কেউ ভরে তোলে আদরে ভালবাসায় -
কেউ রাঁধে মন দিয়ে কেউ খায় মন ভরে।
ওরা সুখ-দুঃখের কথা বলে,
ভাবে কথা ভবিষ্যতের।
সন্ধ্যা নামে ধীরে সে বাড়ির ওপরে,
আর শহরের অলি-গলিতে।
নক্ষত্রপুঞ্জ জেগে ওঠে রাত গাঢ় হলে,
সুখের সংসারে ঘুম নেমে আসে।
সারাদিনের কর্মব্যস্ততা
ডুবে যায় রাতের আঁধারে।
আগামীকালের কথা দূরে রেখে
শুধু রাতের কথা ভাবে এই বাড়ি।
সবাই যখন ঘুমে অচেতন
রাত থাকে জেগে।
চাঁদ তারাদের ধরে থাকে নিশ্চিন্ত হাত।
বাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ
শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা... বারোমাস।

ভালবাসা স্মৃতি হয়ে যাবে

স্বপ্নেন্দু ভৌমিক

দক্ষিণের জানালাটা খোলা রেখে শুই,
বসন্ত বাতাসের মোহে...
শীতটা কেমন জানি কেঁপে কেঁপে
হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যায়।

ঈশ্বরকে পিতা ভেবে চোখদুটো
নিমীলিত করি অন্ধকারে ,
দুঃখের পাহাড়ে আবৃত থাকি অসাবধানতায়।
একটু সুস্থতার জন্য ভালবাসা খুঁজে বেড়াই।

সারা বিশ্বজুড়ে সবাই কেমন অস্থিরতায় ভোগে
একটু শান্তি, একটু ভালবাসার জন্য।
সবচেয়ে মূল্যবান এই ভালবাসা শব্দটা,
এরই জন্য পৃথিবীটা বার বার কেঁপে কেঁপে ওঠে।
এত আত্মহননের সংবাদ পড়ি
নির্বিকার থেকে।

দক্ষিণের জানালা দিয়ে বসন্তের বাতাস জানি
ধুয়ে দেবে কাল।
স্বপ্নই বিশ্বাস করি সূর্যের চারদিকে
পূর্ণতাকে ছড়িয়ে দেবে ভালবাসার অন্ধ মোহে।
দিনরাত্রির প্রবাহ স্তব্ধ হয়ে গেলে
একদিন হয়তো ভালবাসাও স্তব্ধ হয়ে যাবে।

শান্তিনিকেতন

জয়দীপ চট্টোপাধ্যায়

ছুটছে দ্রুত ব্যস্ততম দিন
ওয়াই-ফাই জোন, ডিজিটাল বসবাস
কথা হয় শুধু, অদেখাই কতদিন
আমি তো দুবাই তোর ঠাঁই মরিশাস

শেকড় এখন মাটির ঠিকানা খোঁজে
জীবন-জীবিকা ঘরছাড়া করে রোজ
হাসিমুখে হাঁটি অন্তরে হাহাকার
তুই কি কখনও রেখেছিস তার খোঁজ!

নীলাকাশ নীচে আমরা প্রান্তবাসী
ভিডিও কলেতে হয়তো বা সাক্ষাৎ
হাইরাইজ ফ্ল্যাট মেঘেদের কাছাকাছি
বাহারি জীবন অন্তরে ধারাপাত

নতুন বছরে এবার ফিরব দেশে
আলপথ ছুঁয়ে হেঁটে যাব কৈশোর
সবুজবেলা স্বজন-বন্ধু স্মৃতি
প্রভাতপাখির লাবণ্য আলোভোর

রবীন্দ্রতীর্থ প্রাণের আবাদভূমি
যাবই এবার শান্তিনিকেতন
রাঙামাটির হৃদয় কলতানে
ভুবনডাঙায় স্মৃতির আলাপন

ঠিকানা আমার অজানা নয় তোর
সোনাঝুরি হয়ে কেয়ার অফ্ 'ত্রিনয়ন'
নতুন বছরে খুব পেতে চাই তোকে
মরিশাস থেকে প্লিজ আয় প্রিয়মন।

সবার শরৎ

কমলপ্রিয়া রায়

শরৎ আলোর বাঁশি বাজে
সারা দিবস ধরে
ধানের ক্ষেতে নীল আকাশে
মৃদু মধুর সুরে।

শুভ্র মেঘের ক্ষণিক পরশ
নীল আকাশের মাঝে
স্মৃতির অতল গভীরতায়
কী সুর যেন বাজে।

কাকে যেন পাবার আশায়
মন যে দিল ডাক
শিউলি ফুলের আকুল ঘ্রাণে
রুদ্ধ আমার বাক।

ঘরের দুয়ার খোলা আমার
আলোয় ভাসে ভুবন
শরৎ যেন দ্বারে এসে
ভরাল মোর জীবন।

আমার শরৎ তোমার শরৎ
শরৎ সকলেরই
আনন্দ গান গেয়ে আজি
হৃদয় নেব হরি।

হিসেব ছাড়া

শঙ্কর তালুকদার

আকাশ যদি ডাকে আমায়
প্রাণে জোয়ার এনে
পাখনা মেলে উড়ে যাব
ওই আকাশের পারে,
থাকব না মিথ্যে নিয়ে
সকল ভিড়ের মাঝে
শূন্য বুকে কাঁদব না
কারও আড়াল নিয়ে।

আকাশ যদি ডাকে আমায়
হিমেল পরশ দিয়ে
রইব না কক্ষমাঝে
মিথ্যে শীতের ভয়ে,
আপন মনে বাইব আমি
সকল ভাষার মাঝে
জ্ঞান-ভাঁটার দোলায় দুলব
নিত্য নতুন সাজে।

আকাশ যদি ডাকে আমায়
নগ্ন রূপের সাজে
চেতনা মোর উঠবে জ্বলে
উছল করা রোদে,
ঘরের কোণে রইব না
চোখে আড়াল টেনে
সজাগ হয়ে দেখব সব
কোন রঙ্গেতে মাতে।

আকাশ যদি ডাকে আমায়
সকাল-সন্ধ্যা ফেলে
দিন ফুরিয়ে গেছে এবার
ভাবব না তো মনে,
আসুক বাধা সকল ছাড়া
আনন্দে বা আক্রোশে
বিধির তরে রাগ করে তাই
রইব না কোল ঘেঁষে।

আকাশ যদি ডাকে আমায়
লজ্জা পেয়ে শেষে
অবুঝ বালক বুঝব না
তোমায় ভালবেসে,
কেমন যেন ধারা
অঙ্ক কষে মেলে না
সবই হিসেব ছাড়া।

মনসংগীত ১

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

শরৎ এল শারদীয়ার আশিসবারি নিয়ে,
ওরে - বাজা তোরা শঙ্খধ্বনি,
তোরাই মায়ের চোখের মণি,
আয়রে মাকে বরণ করি ঢাকের তালে গেয়ে।

দুঃখ, বিষাদ থাক ভুলে আজ,
আছে বাকি মায়ের যে কাজ,
করব সাধন আজকে মোরা,
মায়ের আশিস চেয়ে।

ছলনা আজ করবে যে জন
লুকিয়ে অন্তরালে,
মায়ের চোখে পড়বে ধরা -
বাঁধবে পাপের জালে।

দেখবে চেয়ে আকাশ পানে
ভাসে মেঘের ভেলা,
শরৎকালের রবি আজি
মাতায় আলোর খেলা -

গাইতে মনের আনন্দ-গান,
আয়রে সবাই ধেয়ে।
"ওরে - বাজা তোরা শঙ্খধ্বনি,
... ঢাকের তালে গেয়ে।"

স্বপ্নরা প্রহর গোনে

সুজাতা দাস

জীবন যেখানে জীবনের মতো,
সেখানে মৃত্যুও পিছোতে থাকে -
নীরবতা যেখানে মুখরিত করে,
ভাষা সেখানে নীরব থাকে -

গল্পেরা যেখানে সাবলীল ভাষায়,
কথারা সেখানে নীরব দর্শক -
অনেক স্বপ্নেরা দিব্বি ঘুমাচ্ছে,
জেগে আছে শুধু নিথর দেহ -

অপলকে চেয়ে নীরব আঁধার
ব্যঙ্গ করে স্বপ্নেরা বার বার -
তবুও ভাষারা খুঁজে ফেরে ভাষা,
যা স্বপ্নেই জীবন্ত রূপকথা -

পিছু ফিরে দেখা অতীতকে শুধু
তাকিয়ে দেখছে হারানো সবকিছু -
যদি কখনও ভেঙে পড়ে বিশ্বাস,
কৃষ্ণাকে পাঠালাম শারদীয়ার জন্য -
খুব নীরবে শুধু কাঁদবেই প্রহর।

সোনার মেয়ে স্বপ্না বর্মন

ডলি ব্যানার্জী

স্বপ্না বর্মন - উত্তরবঙ্গের এক গরিব কন্যা
প্রতিভায় যার নেই তুলনা -
অসামান্য এই ভূমিকন্যা।
দ্রোণাচার্যের প্রিয় শিষ্য অর্জুনের মতো লক্ষভেদে একাগ্রমনা।
সে সপ্তরথী - বর্ষা ছোঁড়া, হাইজাম্প, লংজাম্প, হেপ্টাথলন -
দিকে দিকে তার বিজয়ের রথ ধাবমান।
উত্তরবঙ্গের ঘন বনানী,
হিমালয়ের সুউচ্চ পর্বতমালা, খরস্রোতা নদী
তিস্তার পারে দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ প্রান্তরে,
খোলা আকাশের নীচে ওর স্বপ্নের তাজমহল।
অসুস্থ মেয়েটির অসাধারণ মনোবল।
অতি গরিবের মেয়ে শিশু হলেও
রাত পোহালেই চলে যায় পাহাড়ের কোলে
ঝড়-জল-বৃষ্টি মাথায় করে
লাঙ্গল চালাতে হয় গরুর পিঠে চড়ে।
ধান লাগাতে হয় জলভরা মাঠে হাতে করে।
কতবার খেয়েছে সে সাপের কামড়;
নেকড়ের তাড়া খেয়ে পালিয়েছে বার বার।
একমুঠো ভাত ছাড়া অভুক্ত থেকেছে কতবার,
একটা ভাল শাড়ি পরনে জোটেনি তার।
হঠাৎ সামান্য মেয়ে হয়ে উঠল অসামান্য;
এশিয়ান গেমসে স্থান পেয়ে নিজেকে মনে করে ধন্য।
কিন্তু পায়ের ছটা আঙুলের জন্য জুতো জোটেনি তার
শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় সে কাতর,
চোখের জলে ভেসেছে নিরন্তর
যখন চলেছে প্রশিক্ষণের কঠিন প্রহর।
বিশ্ববিখ্যাত কোম্পানি "অ্যাডিডাস" ওর
বিশেষ জুতোর করেছে অঙ্গীকার।
হেপ্টাথলনে স্বর্ণপদক বিজয়ী স্বপ্না বর্মন -
এশিয়ান গেমসে জাপানী প্রতিযোগীকে হারিয়ে
জাতীয় পতাকা হাতে ওড়ায় ভারতের বিজয় কেতন।

মাতা-সন্তান-পিতা

রঙ্গনাথ

দেখতে পাই এক বিচিত্র বিধান -
পুত্র-কন্যারা যেন মাতার সন্তান!
আছে এর অসংখ্য প্রমাণ।

কেহ যদি সন্তানকে দেয় গাল-মন্দ
এ জিনিস জননীর ভীষণ অপছন্দ;
কোন ত্রুটি ধরে যদি করে তিরস্কার
হবে বাড়াবাড়ি, পাবে না নিস্তার।

সন্তানকে বল যদি বোকা-পাগল
মা'র অধিকারে পড়বে ছোবল।
সন্তান যদি পায় মিথ্যা অপবাদ
হয় এটা এক ক্ষমাহীন অপরাধ।

মাতা সন্তানকে চোখে চোখে রাখে
সেও বিপদে প্রথম মাকেই ডাকে;
মা'র শত চিন্তা একটু দূরে গেলে
খুশিতে ভরপুর সন্তান ফিরে এলে।

পিতা পাষাণ হয়ে করে কন্যাদান
মা কান্না করে থাকে কোমল প্রাণ।
জামাতা, পুত্রবধূকে মা করে বরণ
পিতার কথা কেহ রাখে না স্মরণ!

কী খাওয়াবে ভাবনাতে মা'ই প্রথম
মা'র রান্নার সুনামও শুনি হরদম।
জুনে পিতৃ-দিবস, মাতৃটা মে-তে
পিতার বিলম্ব হয় সুখবার্তা পেতে।

কেউ চায় না মা প্রথম স্থান হারায়;
কেউ চায় না কোন নিয়ম বদলায়!
সমস্যা নেই; পিতাও চায় না দ্বন্দ্ব -
শান্তিতে থাকাটাই তার বেশ পছন্দ!
যে পিতা বিচক্ষণ, রাখে বুদ্ধি-জ্ঞান
গেয়ে যায় মা ও সন্তানের গুণগান;
চায় সে তাদের কল্যাণ।

(মাতৃ দিবসে সকল মা ও সন্তানদের উদ্দেশ্যে।)

শ্রাবণ-ধারা

নমিতা রায়চৌধুরী

এমনটা তো হয়েই থাকে,
শরতের বুকেও লুকিয়ে কাঁদে শ্রাবণের মেঘ
পিলসুজে বাতির হৃদয় নিংড়ে নিশি হয় ভোর।
ভৈরবী সুর তুলতে গিয়েও সেদিন দ্রবন্তী ডুবে যায়,
অজানা অচেনা বিষাদে!
হয়েই থাকে এমন...

এমনটাও হয়,
সাদা রঙ কাশফুল অবেলায়,
ব্যথার রঙ মেখে হয়ে উঠে গাঢ় নীল!
নিথর পড়ে থাকে বাতি নেভা রাতে -
ভালবাসার বেহুলা শরীর।
তবু সময় আসে, চলেও যায় -
নৈঃশব্দ্যের জানালায় উঁকি দেয় একলা শালিক,
উদাসী দুপুর ইচ্ছে হলেই বসে মনের পাটাতনে।
লেখা হয় আহত দেয়ালে রক্তের আখরে,
হিসেব নিকেশ ছাড়াই -
আরো একটি নতুন নাম!...

সেই কান্না

উদ্দালক ভরদ্বাজ

একটা সবুজ মন ছিল,
আর একটা বিষণ্ন খয়েরী পাখি।

একটা শতচ্ছিন্ন শতরঞ্চি ছিল
চিলেকোঠার ঘরটাতে।
রাজ্যের শালিখ পাখি এসে জড়ো হত সেটায়
একটু বৃষ্টির উপক্রম দেখলেই।
শুধু বিষণ্ন খয়েরী পাখিটা যেত না;
একা একা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজত
তুমুল বৃষ্টিতে।
যেন কোনও পরোয়াই নেই।
কিম্বা অপেক্ষায় কারো -
যে আসবে না কোনদিন, তবু...
পথ-চাওয়াতেই শুধু অধিকার তার,
ছেড়েছে প্রত্যাশা বহু দিন।
ভিজে যাওয়া ছাড়া, দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া
আর কোনও অর্থ নেই জীবনে তার।

শুধু বসন্তের উপক্রমে মাঝে মাঝে সে উড়ে যেত
খোয়াই-ঝিল পথের শেষে, যেখানে
জঙ্গল আর আকাশ মিশে থাকে,
সেইখানে একটা রক্তকরবী গাছের কাছে উড়ে যেত সে।
একমনে, নিঝুম দাঁড়িয়ে দেখত -
রক্তের ফোঁটার মতো কুঁড়ি থেকে ছোট ছোট ফুল হয়ে ওঠা
ভারি ভাল লাগত তার।

রৌদ্রের সোনালী এসে জাগাতো স্বপ্নের কুঁড়িগুলোকে,
রক্তরঙ সোনা মেখে কী এক অদ্ভুত নেশায় জেগে উঠত
উৎসুক কুঁড়িগুলো...
প্রেরণায়, প্রেমে, অসংযমী বাঁচার ইচ্ছায়
দুলে দুলে উঠত ফলন্ত, নিষ্পাপ কুঁড়িগুলো;
ফুল হয়ে ছেয়ে থাকত মায়ের শরীরে কিছুদিন...
তারপর একদিন হাওয়ার তোড়ে
শুকনো, বাদামি, ঝরে যেত ম্রিয়মাণ।
খয়েরী পাখিটা তখন এক-পা, দু-পা ফেলে ওদের কাছে গিয়ে
আলগোছে ঠোঁটে তুলে, উড়ে যেত।
খরস্রোতা মৃন্ময়ী নদীর জলে মৃত ফুলগুলোকে ভাসিয়ে দিয়ে
চুপ করে দাঁড়াত সে লাগোয়া ঘাসের জমিতে।
দু চোখে শিশিরকণা, হয়তো আলোর চেয়ে অন্ধকার ভারি -
এই ভেবে ব্যথার শরীরে তার অন্য আলো ছড়াতো সে কিছুক্ষণ
ফিরে যেত তারপর, পশ্চিম আকাশ পেরিয়ে -
তার একান্ত বাসায়,
নিবিড় ঘুমের ঘরে দিত ডুব।
খয়েরী পাখিটা -
ভালবাসা পায়নি বলে ভালবাসত খুব।

অসুখ

দেব বন্দ্যোপাধ্যায়

এক সারি লাল পিঁপড়ে,
চ্যাটচ্যাটে রক্তের দাগ... শর্করা,
আর নেই...
ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে ফিনাইল দুধ,
ওষুধের শিশি, হলদেটে মলমের খাপ।
শিশুর করতালু থেকে উপড়ে ফেললাম
বারুদ আর পশমের বুনট,
অস্ত্রশস্ত্রের গায়ে লাগে
পরাজিত অসুখ,
অস্পষ্ট ছাপ।

টুকরো কাঁচ, অভ্র-শলাকা,
আর নেই...
শুকনো, ঝুরঝুরে ছাঁকা বালি,
হেঁটে যেতে যেতে...
ঝরে না লালচে নক্ষত্র বীজ...
আকাশে পদচিহ্ন রাখে প্রহরী,
কবিতারা ফুটবে না আর।

এক আঁধার রাতের প্রতীক্ষা

আলী তারেক

ছইহীন টালমাটাল আমার নৌকার
ফাঁকফোকর গলে যখন ঢুকে পড়ত
বুদ্বুদের আনন্দময় শব্দে
পাড়বিহীন নদীর ধূসর গাঢ়তা

যখন আমার আর্দ্র মাটিতে
জমে উঠত সন্ধ্যা পুকুরের
শৈবালের তীব্র সবুজ,
অরক্ষিত আমার ঘাসের ডগায় ডগায়

যখন আমার ভঙ্গুর ডালের
অসহিষ্ণু প্রান্তসীমায় নেচে উঠত
শীতের পাখির পাখার আনন্দধ্বনির মতো
উল্লাসমুখর পত্রপল্লব

যখন আমার আকাশে
ধবল মেঘের অস্থিরতা
ঢেকে যেত সূর্যের অস্তগামী রঙের
উষ্ণতার শিহরণে -

আমার যৌবনের আকাঙ্ক্ষায় তোমার বসবাসের সূত্রপাত |
সেকি তোমার অবয়বের উপকরণ?
সেকি তোমার অস্তিত্বের উপাদান?

তবে কেন শতবর্ষী বৃক্ষের আয়ুচক্রের মতো
বসন্তের পর বসন্ত জুড়ে ধূসর হয়ে আসে রঙ?
হলুদ তৃণাগ্রের নির্মম শুষ্কতায়?
কালবৈশাখীর মার্তণ্ডে শুয়ে থাকা
মৃত সব পাতাদের শবোৎসবে?

কেন তবে শীতের পর শীত জুড়ে
ফিকে হয়ে যায় অগ্ন্যুৎসবের শিখা?
সময়ের অগোচর চতুরতায় ঈগলের তীক্ষ্ণ ঠোঁট
ঠুকরে চলে ভালবাসার উত্তাপ?
প্রাত্যহিকতার ছদ্মবেশ - উড়ঙ্গের বিষদন্ত
ঘনীভূত করে যায় রক্তের উষ্ণতা?

আলিঙ্গনের উত্তাপ শরীরের আচ্ছাদন ভেদ করে যেতে যেতে
মনের অলিন্দে এসে উবে যায় বিরহের নিঃশ্বাসে?
ওষ্ঠের রোমাঞ্চ দেহের কম্পনে ভর করে চলতে চলতে
হৃদয়ের প্রকোষ্ঠে পৌঁছে হয়ে যায় দুঃসহ স্থবির?

তবে কি বিচ্ছেদের নিরন্তর কলহ রয়ে যাবে
তৃপ্তির পেছনে নির্বোধ ছুটে চলা কামনার অতৃপ্ত মূঢ়তায়?

হয়তো এই অর্বাচীন ধাবমান আকাঙ্ক্ষার সময় আজ বিদায়ের |
"না চাহিলে যারে পাওয়া যায়
তেয়াগিলে আসে হাতে
দিবসে সে ধন হারায়েছি ..."

জন্ম জন্মান্তর আমি রইলাম
এক আঁধার রাতের প্রতীক্ষায় |

অন্ধ সময়ের পাঁচালী

অজয় সাহা

বন্য অন্ধকারের সোজাসাপটা সুপারিশে
হ্যাংলা হাতগুলো যখন
উপচে পড়ে দেদার বকশিসে
কাক চিলরাও বুঝিবা লজ্জায়
ঘরে ফেরে, এমনই
কমে আসা আলো বা আলেয়ায়
কারা যেন দুন্দুভি বাজায়
কারা যেন ধড়-মুন্ড খুলে
তীব্র নেশার ঘোরে অথবা নেহাতই পেশার তাড়নায়
এক ভিড় থেকে অন্য ভিড়ের
কাছে নাগাড়ে আওড়ে চলে
পথ বাতলায়
গভীর খাদের দিকে,
জঙ্গলের আরও ভিতরে নাকি
অলকানন্দা বয়!

কবিতার মৃতদেহ

সুজয় দত্ত

এ-কলম আজ শব্দ খুঁজতে থামেনি
খুঁজে নিতে চায় এককণা নৈঃশব্দ্য
এ-হৃদয় আজ অনুরাগ-রঙে রাঙেনি
তীক্ষ্ণ, কঠিন আঘাতে হয়েছে স্তব্ধ

দুটি চোখে আজ স্বপ্নেরা নয় স্বাগত
ভেঙে যাক ঘুম, শিহরিত হোক অঙ্গ
প্রিয়জন সাথী - কেউ যেন আজ না আসে
কেটে যাক দিন নিশ্চুপ নিঃসঙ্গ

সোনালী আলোর রোশনাই আজ ঢেকে যাক
গহন মেঘের আঁধারে নামুক সন্ধ্যে
না-ফোটা ফুলের কুঁড়ি ঝরে যাওয়া বেদনা
জড়িয়ে থাকুক মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে

যত অভিমান, পুঞ্জিত ক্ষোভ, নিরাশা
ঢেউ হয়ে আজ আছড়ে পড়ুক চেতনায়
তার অভিঘাতে আমার গভীর সত্তা
কুঁকড়ে উঠুক তীব্র, প্রখর যাতনায়

থেমে যাক যত হাসি-আনন্দ-কলতান
স্নায়ুর তন্ত্রে বাজুক বিষাদ রাগিণী
মধ্যাহ্নেও মনে হয় যেন কোনোদিন
এমন নিবিড় তামস-রাত্রি জাগিনি
অন্তর ছিঁড়ে ফোঁটা ফোঁটা ঝরা রক্ত
সুন্দর তারে বোলোনা তোমরা কেহ
কবিতা আমার থমকে গিয়েছে কলমে
যা লিখেছি সে তো কবিতার মৃতদেহ

স্বপ্ন

মিশা চক্রবর্তী

এক মিষ্টি রাতের অবুঝ কথা -
স্বপ্ন হয়ে ফোটে,
রাতজাগা এক ব্যস্ত ভ্রমর -
গুনগুনিয়ে ওঠে!

যত্ন করে ফোটানো ফুল
মন ভরানো বাস।
দিক ভুলানো ভ্রমর তখন
দিক হারানোর আশ!

ফুল যে তখন রং হারিয়ে
অভিমানে লাল!
ব্যস্ত ভ্রমর দৃষ্টি এড়ায়
আজ পেরিয়ে কাল!

ফুল তো এখন পূজার থালে
লক্ষ্মী হয়ে থাকে!
ক্লান্ত ভ্রমর বৃথাই এখন
ফুলকে খালি ডাকে!

কালবৈশাখী

সফিক আহমেদ

তোমার ঝোড়ো উন্মাদনায়
নিটোল সোহাগী সম্পর্কে
বেঁধেছিল ক্ষয় রোগের বাসা।
অকাল কালবৈশাখী
ভৈরব বেশে ভেঙেছিল
কথামালায় সাজানো সংসার।
বিধ্বস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনে
অনুতাপ আর অনুশোচনার আঁচে দগ্ধ হৃদয়
অন্তহীন মহাসাগরে আবার চাইছিল
স্পর্শ করতে বালুতটের উচ্ছল ঊর্মিমালাকে।
হৃদয়ের উষ্ণ প্রস্রবন অশ্রুর ধারাপাতে
খুঁজছিল সবুজ বুকের ওম,
তৃষিত মন উদ্বেল হয়ে উঠেছিল
দৃঢ় আলিঙ্গনের বাহুবন্ধনে নিষ্পেষণ আর
ওষ্ঠের উষ্ণ চুম্বনের চাতকী আকাঙ্ক্ষায়।
চেয়েছিলে তোমার গহীন উপত্যকায়
পৌরুষত্বের অগ্ন্যুৎপাত,
সংস্কারের সীমানা ভেঙে
দেশ,কালের গন্ডি ছাড়িয়ে
অকম্পিত স্বরে উচ্চারণ করেছিলে,
আমি কবিতা নই,
আমি রক্ত মাংসের নারী।
প্রবাহিত হয়েছিল শাশ্বত প্রেম।
অবদমিত আকাঙ্ক্ষার শীৎকার
প্রতিধ্বনিত হয়েছিল নিস্তব্ধ প্রকৃতিতে।
রচিত হয়েছিল বাৎস্যায়ন।
বিধ্বংসী কালবৈশাখীর পরে
নেমে এসেছিল অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা।
সিঞ্চিত হয়েছিল অকর্ষিত জমিন।

মনসঙ্গীত ২

অচিন্ত্য কুমার ঘোষ

ওরে মন রে ওরে মন,
তুই নিশিদিন কোথায় ফিরিস
খুঁজিস কোন নয়ন?

যার দরশন মিলবে বলে
থাকিস দ্বারে চেয়ে,
তার প্রেমাতুর দৃষ্টি যেন
বক্ষে আসে বেয়ে।
দিগন্তে তার সৃষ্টি বুঝি
দেখিস অনুক্ষণ।

আয় ফিরে আয় অন্তঃপুরে
দেখ ভোরে দেখ সাঁঝে,
দিবস জুড়ে আলোর বীণা
বাজে মনের মাঝে।

পরশ অতীত সে যেন রে
স্নিগ্ধ ফুলের সুবাস,
মুগ্ধ নীরব চোখের ভাষায়
বাক্য অতীত সুভাষ।
অন্তরে তাই যতন করে
পাতিস প্রেমাসন।

বৃষ্টি

রত্না ব্যানার্জী

আষাঢ়ের এক রোদ-পালানো দুপুরবেলায়
ধূসর অঙ্গবাস জড়িয়ে
খেলে বেড়ায় পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ
আকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে,
যেন দামাল ছেলে-মেয়ে!
অগ্নিবাণে জ্বলছে মাঠ-ঘাট,
উষ্ণতায় আমি অস্থির!
তাই আকাশের দিকে তাকিয়ে
গলা চড়িয়ে বলি -
'ওহে ধূসর মেঘের দল, বারিবাহক,
এবার তোমরা বলো তো
বৃষ্টির কখন আসা হবে?'
ভাসতে ভাসতে নাচতে নাচতে
মেঘের দল উচ্চৈঃস্বরে বলে -
'আসবে গো বৃষ্টি আসবে, সময় হয়েছে,
একটু অপেক্ষা করো।'

দিন গেল, সন্ধ্যা এল, বাদলও এল ঝেঁপে।
মেঘেরা মুচকি হেসে কৌতুক করে বলে,
'আমরাই এলাম গো বাদলধারার বেশে।'
জানালা দিল খুলে উতল হাওয়া এসে।
এক ঝলক ঝমঝম বৃষ্টি ছুটে এল ঘরে।
পর্দাগুলো দুলে দুলে বৃষ্টির হাত ধরে।
ইতিমধ্যে ডুবে গেছে আমার এক চিলতে উঠোন।
তার উপরে বৃষ্টি নাচে জয়জয়ন্তীর সুরে
মেঘমল্লার বাজে সেতারে।
আমি গাই গুনগুনিয়ে সব ক্লান্তি করে দূর
'বৃষ্টি বৃষ্টি' কী সুমধুর সুর!
কেতকী-কাঞ্চন বাগানের এক কোণে
করে বৃষ্টি-স্নান।
গরু ফেরে গোয়ালে বাছুর নিয়ে
সদ্যস্নাত কপোত-কপোতী বসে এসে কার্নিশে।
হঠাৎ বৃষ্টিকে জাপটে ধরে বলি -
'কতদিন পরে এলে,
সেই এসেছিলে আষাঢ়-শ্রাবণে,
বারোমাস আগে।'
বর্ষারানীর মুখ তুলে বলি -
'তুমি ভরা বাদল,
আমি তোমার বর্ষাবিন্দু।'

অবুঝ

মিশা চক্রবর্তী

আজ যে অবুঝ, কাল বুঝে যায়
জীবন যাওয়া আসা!
চালচুলোহীন মনকে নিয়ে,
সাতকাহনে ভাসা।

ছন্নছাড়া হতাশ সমাজ -
ধমকে দেবে রোজ।
রোজনামচা ঝালিয়ে নিতে,
মাথায় বিষম বোঝ!

টিপেটিপে পায়ে হাঁটতে থাকাই
যখন কেবল গতি!
ফেরবারও পথ একটা উপায়!
থাকত মনে যদি?

হয়তো মনের দেয়াল লিখন -
অন্যরকম হতো!
দিতাম সাড়া হাতছানিতে -
জীবন মনের মতো!

অসম্ভব

সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ যখন সেই ঘটনার কথা মনে পড়ে, বিশ্বাস হতে চায় না, এও কী সম্ভব! কী করে সেই আশ্চর্য সম্ভব হয়েছিল?

এখন যতটা মনে পড়ে - প্রায় ২০-২৫ বছর আগে এক পড়ন্ত বিকেলে সবে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে বারান্দায় বসে স্ত্রীর তৈরী করা গরম চা খাচ্ছিলাম | তখন বোধহয় বিকেল পাঁচটা কি ছ'টা হবে, প্রায় সন্ধ্যে নেমে এসেছে | আমার ঠিক খেয়াল হয়নি যে বারান্দার সামনে, প্রায় রাস্তার ওপরে একটি নয়-দশ বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে |

আমি ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, "কী রে, কী ব্যাপার? রাস্তার ওপরে ঐভাবে দাঁড়িয়ে আছিস কেন?"

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ এবং দেখতে শুনতেও ভাল | আমি ভেবেছিলাম বুঝি পয়সাকড়ি চাইবে | কিন্তু সে বলল, "বাবা, আমায় একটা ঘুড়ি কিনে দেবে? আমি আকাশে ওড়াব |"

আমি বুঝতে পারলাম না এ কেমন আবদার | আমার প্রশ্নের উত্তরে সে জানাল, তার বাবা মা কেউ নেই, রাস্তার ধারেই পড়ে থাকে | আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, "তুই ঘুড়ি ওড়াতে জানিস? তোর কাছে লাটাই আছে, সুতো আছে যে ঘুড়ি কিনে দিলেই ওড়াতে পারবি?"

সে বলল, "বাবা, আমার কিচ্ছু নেই | আছে অনেক স্বপ্ন | ইচ্ছে করে আমিও একদিন ঘুড়ির মতো ওই মস্ত নীল আকাশে মেঘের মধ্যে ভেসে বেড়াব | দূরের ওই পাখিগুলোর সঙ্গে লুকোচুরি খেলব | আর যখন মেঘ বা পাখি কিছুই আকাশে থাকবে না, আমি ওই শূন্য নীল আকাশে এঁকে বেড়াব অনেক ছবি |"

আমি বেশ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ওর মুখের দিকে | তারপর ওকে জিজ্ঞেস করলাম, "তোর নাম কী?" ও বলল রাস্তার লোকেরা ওকে 'নীল' বলে ডাকে | মনের মধ্যে দানা বাঁধল - ওর চিন্তার সঙ্গে ওর নামের একটা মিল আছে | যাইহোক, আমি বললাম, "তুই কালকে আসিস | তোর জন্য আমি সবকিছু কিনে আনব |"

পরের দিন অফিস ফেরতা বাজারে থেমে প্রয়োজনমতো সবকিছু কিনে নিলাম | বাড়ির কাছে যখন গাড়ি থেকে নামলাম, দেখি নীল আমাদের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে | আমার কাছ থেকে ঘুড়ি, লাটাই, সুতো পেয়ে ভীষণ খুশি হ'ল | মাথা নীচু করে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, "বাবা, তুমি কাল বিকেলে ছাদে উঠো, দেখবে আমি কেমন এই ঘুড়ি দিয়ে কত ছবি আঁকব আকাশের গায়ে |"

মানুষের জীবন এক আশ্চর্য ছন্দে ঘোরে | পরের দিন আমি অফিস থেকে বাড়িতে ফিরতে পারিনি | সোজা চলে যেতে হয়েছিল দিল্লিতে একটা অসম্ভব জরুরি কাজের জন্য | ফিরে এলাম প্রায় সপ্তাহ দুয়েক পরে | মনের মধ্যে থেকে ওই ঘটনার কথা একদম মুছে গিয়েছিল |

তারপর বহুদিন কেটে গেছে | আমি ইদানীং কাজ থেকে অবসর নিয়েছি | রোজ বিকেলে ওই বারান্দায় বসে কফি খাই | আর রোদ পড়ে এলে বাড়ির পাশে ঢাকুরিয়া লেকে একবার পায়চারি করতে যাই |

সেদিন আমি কফি খেয়ে হাঁটতে বেরোব, হঠাৎ দেখি বাড়ির সামনে একটা নতুন ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়াল | তার থেকে একজন যুবক নেমে এসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা আমাকে চিনতে পারছ?"

আমি বললাম, "কৈ না তো, আমি তো আপনাকে চিনি না |"

যুবকটি আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, "আমি নীল, তুমি আমায় প্রায় কুড়ি বছর আগে ঘুড়ি কিনে দিয়েছিলে |"

আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না দেখে সে বলে ওঠে, "মনে পড়ে, আমি বলেছিলাম ঘুড়ি দিয়ে নীল আকাশে ছবি আঁকব?"

মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু মনে পড়ে গেল | আমার অবাক হয়ে যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে সে বলল, "বাবা, তুমি আমার স্বপ্ন সার্থক করেছ | পরের দিন আমি ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে একজনের গাড়ির ধাক্কায় ভীষণভাবে আহত হই | বেশ কিছুদিন হাসপাতালে থেকে যখন সুস্থ হলাম, তখন জানলাম আমাকে ওঁরা সারা জীবনের জন্য আশ্রয় দিয়েছেন | আমার সেই পালক পিতা-মাতা আমাকে লেখাপড়া শেখাবার জন্য হস্টেলে পাঠিয়েছিলেন | তারপর আমি এঞ্জিনিয়ার হয়ে বেরোলাম | এরপর আমি চলে যাই বিলেতে এমএস করবার জন্য | কিন্তু তোমায় কোনদিনও ভুলিনি | কতবার ভেবেছি তোমার সঙ্গে দেখা করে যাব, কিন্তু আসিনি | ঠিক করেছিলাম যেদিন আমার ছবি আঁকা শেষ হবে, সেদিন এসে তোমার কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে যাব | যে আমায়

রঙ আর তুলি কিনে দিয়েছিল | যার জন্য আমার জীবনে এতবড় অসম্ভব সম্ভব হ'ল! আজ আমায় তুমি আশীর্বাদ করো বাবা |"

ফিশফ্রাই ও তালের বড়া

ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

আসুন আসুন | মৎস্যমন্ত্রী তাকে সাদরে আহ্বান করলেন | হকচকিয়ে গেল সে | এতটা আশা করেনি | কোন সকালে মেদিনীপুর থেকে রওনা হয়েছে | সারারাত ঘুমোতে পারেনি | মিনতিকে পাওয়া যাচ্ছে না | ছেলেকে নিয়ে মিনতি হাওয়া | মৎস্যমন্ত্রী তাঁর এলাকার বিধায়কও বটে | সবাই বলল যে, হিরণ্ময়দার কাছেই যাও | পারলে উনিই পারবেন | খিটিমিটি হয় না এমন কোন সংসার আছে নাকি? তাই বলে এভাবে কেউ বাড়ি ছেড়ে চলে যায়?

"বসুন, ফিশফ্রাই খান | এখানে একটা প্লেট দিয়ে যাও তো |"

বেলা বারোটা নাগাদ মন্ত্রী তাঁর চেম্বারে এসেছেন | তাঁর ঘরেই মিটিং হচ্ছে | আতুর পুকুর থেকে তুলতে গেলেই মাছের চারাগুলো মরে যাচ্ছে | হাইব্রিড চারা | সমস্যার সমাধান করতে পারলে দেশে আর মাছের আকাল থাকবে না | এক একটা মাছের সাইজ তিন চার মাসেই একটা ছোট পাঁঠার মতো দাঁড়াবে |

ঠিক এই সময়েই সে ঢুকল | প্রথমে তাকে ঢুকতে দিতে চায়নি কেউ | কিন্তু সে সবিনয়ে বলল, "স্যারকে বলুন আমি দেশ থেকে এসেছি |"

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতো কাজ হ'ল | পিএস নিজে সঙ্গে করে মন্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলেন | বললেন, "স্যার ইনি দেশ থেকে এসেছেন |"

মন্ত্রীও কেমন গদগদ হয়ে তাকে অভ্যর্থনা করলেন |

খিদে পেয়ে গেছে খুব | মনে যদিও উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগ কাজ করছে, কিন্তু ফিশফ্রাইতে একটা কামড় দিল সে | বেড়ে বানিয়েছে কিন্তু! কেচাপ কাসুন্দি দিয়ে মন্দ নয় |

"তারপর আপনাদের প্রজেক্ট কেমন চলছে," মন্ত্রী প্রশ্ন করেন | কী প্রজেক্ট কী বৃত্তান্ত সে কিছুই জানে না | কিন্তু ফিশফ্রাইয়ের সঙ্গে কফিও এসে গেছে। এগুলো খাওয়া পর্যন্ত যেমন চলছে চলুক|

গম্ভীরভাবে সে বলে, "ভালই | তবে একটু সমস্যা আছে | আপনাকে আলাদা করে বলব |"

মন্ত্রীর মুখের ভাব পালটে যায় | সমস্যা! বলেন কী? জাপানি মাছের চারাগুলোকে তো বাঁচাতেই হবে |

ততক্ষণে ফিশফ্রাই আর কফি দুটোই খতম |

মন্ত্রীর ইশারায় অ্যান্টি চেম্বারের দরজাটা খুলে দেওয়া হয়। মুখোমুখি সে আর মন্ত্রী। দরজা বন্ধ। সে বলে, সমস্যা হ'ল মিনতিকে পাওয়া যাচ্ছে না। মন্ত্রীর তখন বিষম খাবার জোগাড়।
"কে মিনতি? আপনি দেশ ফিশারিজের ভুতোরিয়া নন, যার আজ আসার কথা ছিল?"
সে ঠোঁটে আঙুল ছোঁয়ায় – "আস্তে আস্তে, হিরণদা। আপনি এতটা ভুল করেছেন এটা লোককে জানানোর কী দরকার?" যাকগে, কাজের কথায় আসি। আমি দেশ ফিশারিজের কেউ নই।" আমার মতো চেহারার লোকের নাম যে ভুতোরিয়া হতে পারে এটা আপনি কিভাবে ভাবতে পারলেন তাও জানি না। দেশ বলতে মেদিনীপুর জেলা বুঝিয়েছি। যাইহোক, আমি আপনার কনস্টিটোয়েন্সির ভোটার। দুয়েকবার দেখেছেন। হয়তো মনে নেই। মিনতি আমার বৌ। ঝগড়াঝাঁটি করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে গতকাল। তার বাপের বাড়ি আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি কোথাও নেই। ফোন সুইচড-অফ। কেউ হদিশ দিতে পারছে না। আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। এখানে কাউকে কিছু বলার দরকার নেই।"
হতভম্ব মন্ত্রী ফোন করলেন স্বরাষ্ট্রসচিবকে। মোবাইল থেকেই। স্বরাষ্ট্রসচিব খুব খাতির করলেন তাঁকে। লিখিত বিবরণ জমা করলেন। সমস্ত থানায় থানায় খবর চলে গেল মুহূর্তে।
"একটু ফিশফ্রাই খান।"
আবার ফিশফ্রাই! স্বরাষ্ট্রসচিবের এই অনুরোধ রক্ষা করতে তার আর ইচ্ছে হ'ল না। এক নম্বর, খিদে তেমন নেই। দুই, উদ্বেগটা আবার ফিরে আসছে।

সমস্ত দিনটা অস্থিরতায় কাটল। কলকাতায় থেকে আর লাভ নেই। সে বাড়ি ফিরে এল মেদিনীপুরে। রাত হয়ে গেছে। কিছু খাবার রুচি আর নেই। নানাভাবে মনকে প্রবোধ দিচ্ছে সে। যখন কোন খারাপ খবর নেই তখন চিন্তারও কিছু নেই।
এইভাবে কতটা সময় পেরিয়েছে জানা নেই। রাত আড়াইটে নাগাদ ফোন বেজে উঠল। গম্ভীর গলার আওয়াজ। জগদ্দল থানার ওসি বলছি। নিন কথা বলুন।
মিনতির বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বর ভেসে এল – "সত্যি, পারোও বটে! এই রাত দুপুরে পুলিশ পাঠিয়ে আমাকে খুঁজে বের করলে। একটু যদি ব্যবহারটা ভাল করতে তবে তো এই ঘটনা ঘটত না। আমি অবশ্য সকালের ট্রেন ধরেই বাড়ি ফিরতাম। তোমার জন্য চিন্তা শুরু হয়ে গেছিল।"
"কিন্তু তুমি জগদ্দলে পৌঁছালে কেমন করে?"
"কেন? কেমন করে আবার? ট্রেনে করে। ছেলের স্কুলের ছুটি। নপিসির বাড়ি অনেকদিন যাওয়া হয় না। বুড়ি তো একা একাই থাকে। এদিকে বাগানে তো রোজ ঢিব ঢিব করে তাল পড়ছেই। ভাবলাম, পিসি তালের বড়া ভালবাসে, কয়েকটা বানিয়ে নিয়ে যাই। তোমাকে কিছু জানাব না। রোজ রোজ খিটিমিটি - জব্দ করা যাবে বেশ যাহোক। আর তুমি কিনা পুলিশ টুলিশ পাঠিয়ে যা তা কাণ্ড পাকালে!"
কোথা থেকে খবর-টবর জোগাড় করে ঠিক খুঁজে বের করেছে আমাদের। বোধহয় আমার মা'র কাছ থেকেই এই আস্তানার খোঁজটা পেয়েছে!

অশনি সংকেত

বৈশাখী চক্কোত্তি

সন্ধ্যে সাতটা | আরব সাগরের তীরে সাতটা হ'ল গোধূলি | ছোট্ট স্টুডিও অ্যাপার্টমেন্ট | খুব ছিমছাম গোছানো | ঘর সাজাতে খুব ভালবাসে বৃষ্টি | ফ্ল্যাটের প্রধান আকর্ষণ হ'ল ব্যালকনিটা | দাঁড়ালেই সামনে আরব সাগরের বেলাভূমি | ছোট্ট হলেও ব্যালকনিটাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়েছে বৃষ্টি, বিভিন্ন পাতাবাহার আর ক্যাকটাস দিয়ে | দুটো বেতের চেয়ার আর একটা ছোট সেন্টার টেবিলও রেখেছে | সন্ধ্যের পর এখানে বসে দূরে সমুদ্র দেখে | রাতের সমুদ্রের এক অদ্ভুত নেশা | রাতের সমুদ্র টানে বৃষ্টিকে |

আজ ছুটির দিন পড়েছে | কিছু বলেনি ও রোদ্দুরকে | দেখতে চায় রোদ্দুরের মনে আছে কিনা | বিকেলের চান সেরে খুব সুন্দর করে নিজেকে সাজায় বৃষ্টি | একটা মীরর আর বিডস্ এর কাজকরা নেভি ব্লু আর হট পিঙ্ক কম্বিনেশনের স্লিভলেস কুর্তি আর হট পিঙ্ক-এর ওপর থ্রেড ওয়ার্কের লং স্কার্ট | চোখে নীল আইশ্যাডো | নেভি ব্লু আই লাইনার | হট পিঙ্ক লিপস্টিক | চ্যানেলের প্রিয় পারফিউম | গলায় রোদ্দুরের দেওয়া বিডস্-এর বড় মালা | এক হাতে উড আর গালার চুড়ি | কানে ঝোলা মিরর ওয়ার্কের দুল | বার্গেন্ডি রঙের লেয়ার কাট চুল শ্যাম্পু করে ছেড়ে রেখেছে | সব মিলিয়ে চমৎকার লাগছে তাকে | আজ তার একত্রিশতম জন্মদিন | গত ন'বছরে একবারও ভুল হয়নি রোদ্দুরের |

বৃষ্টি ইংলিশে এম.এ করার পর পুনার এক বিখ্যাত কলেজে Mass Communication নিয়ে PGDM করতে যায় | দুই বছরের ছোট রোদ্দুরের সাথে আলাপ সেখানেই | সিনেমাটোগ্রাফির ব্রাইট স্টুডেন্ট সে | দুজনের ফ্রিকোয়েন্সি ম্যাচ হওয়াতে সম্পর্ক গভীর হতে সময় বেশী লাগে না | পাস করার পর দুজনেই মুম্বাইতে বসবাস শুরু করে | বৃষ্টি একটা নামী ইংরেজি পত্রিকার এডিটর | আর রোদ্দুর? বেশ কয়েকটা প্রাইজ পেয়েছে আন্তর্জাতিক মানের শর্ট ফিল্ম করে | তাছাড়া একটি নাম করা প্রোডাকশন হাউসে কাজ করে সে | ওরা চেষ্টা করছে আমেরিকায় যাবার | ইমিগ্রেশনের প্রসেস চলছে | বৃষ্টির বাবা মা থাকেন কলকাতাতে | ওঁরা অনুমতি দিয়ে দিয়েছেন | বাকি একটু সমস্যা... রোদ্দুরের বাড়ি | আশা করা যায় সেটাও হয়ে যাবে |
ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন সাড়ে সাতটা বেজে গেছে খেয়াল করেনি সে |

চমক ভাঙল ডোরবেলের আওয়াজে | ম্যাজিক আই দিয়ে দেখে রোদ্দুর দাঁড়িয়ে, হাতে একটা বিশাল প্যাকেট নিয়ে | খুব ইনোসেন্টভাবে কিছু না জানার ভান করে দরজা খুলল সে | হাতের প্যাকেটটা টেবিলে রাখে রোদ্দুর |

- আরে, রোদ্দুর! তুই! হঠাৎ না বলে?
- শশশ... শাট আপ!
- হোয়াট?
- ফর গডস সেক, হোল্ড ইয়োর টাঙ্গ এন্ড লেট মি লাভ |
- হুম্ | জন ডান |

কথা শেষ করতে দেয় না রোদ্দুর | বৃষ্টির কপাল, চোখ, গাল, কানের লতি ও ঠোঁট চুম্বনে চুম্বনে অতিষ্ঠ করে তোলে | বৃষ্টি বলার চেষ্টা করে... 'আরে আরে আমার লিপস্টিক...'

- শশশ... বৃষ্টির কানের কাছে মুখ এনে রোদ্দুর বলে, হ্যাপি বার্থডে মাই ডার্লিং, ছোট্ট সাদা হাতি |

বলেই দৌড়ায় ব্যালকনির দিকে | বৃষ্টি সাধারণ বাঙালি মেয়েদের থেকে অনেক বেশি ফরসা, কিন্তু একটু গোলগাল, কিন্তু মোটা বলা যায় না | ওকে রাগানোর জন্য "সাদা হাতি" বলে রোদ্দুর |
রোদ্দুরের পেছন পেছন বৃষ্টি দৌড়োয় ওকে মারার জন্য | কপট রাগ করে | দু'চারটে কিল চড় রোদ্দুরের পিঠে চালায় | রোদ্দুর বলে, 'আরে আমি তো মরেই যাবা' ওর মুখে চাপা দেয় বৃষ্টি | বলে, 'আজ আমার জন্মদিনে একথা মুখে আনিস না রোদ্দুর |' ওর চোখ ছলছল করে ওঠে |

- ব্যস, এই না হলে বাঙালি মেয়ে! কিছু না পারলেই প্যাঁ | বিসমিল্লাহ্ খান বোধহয় তোদের কথা চিন্তা করেই এত সুন্দর বাজাতেন |
- আবার! দেখবি তবে?
- না জগৎ জননী, তোমার চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী রূপ আমি দেখতে চাই না | দয়া করো, প্লিজ |
- দয়া করতে পারি, বাট ওয়ান কন্ডিশন |
- ইয়েস, মাই লর্ড - বান্দা অলওয়েস অ্যাট ইয়োর সার্ভিস |
- একটা গান শোনা |
- ব্যস, এইটুকু?

রোদ্দুর শুরু করে মাঝখান থেকে, "এককাপ চায়ে আমি তোমাকে চাই ..." সুমনের "তোমাকে চাই" |

বৃষ্টি চোখ বুজে শুনতে থাকে | গান শেষ হলে চোখ খুলে দেখে তার ছোট্ট কাঁচের ডাইনিং টেবিলটা ভারি সুন্দর করে সাজিয়েছে রোদ্দুর | টেবিলের মাঝখানে তার অতি প্রিয় ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক | মাথায় একটি মোমবাতি | এক কোণে ফুলদানিতে টকটকে লাল একগুচ্ছ গোলাপ | একটা রেড ওয়াইনের বোতল | দুটো সুদৃশ্য কাঁচের গ্লাস | আর একটা ছোট্ট সুন্দর গয়নার বাক্স | বৃষ্টির কাছে গিয়ে হাত বাড়িয়ে দেয় রোদ্দুর |

- মাই ডার্লিং, আমার ছোট্ট সাদা হাতি, আয়, কেক কাটবি আয় |

এবার আর রাগ করে না বৃষ্টি | রোদ্দুরের হাত ধরে এগিয়ে যায় | মোমবাতি নেভাতেই হাততালি দিয়ে রোদ্দুর "হ্যাপি বার্থডে টু ইউ" গেয়ে ওঠে | কেকটা কেটে আগে রোদ্দুরকে খাওয়ায় বৃষ্টি | রোদ্দুরও খুব ভাল মানুষের মতো কেকের একটা টুকরো নিয়ে বৃষ্টিকে খাওয়ানোর ভান করে তার সারা মুখে মাখিয়ে দেয় | আবার বৃষ্টি তাড়া করে রোদ্দুরকে |

অবশেষে হালকা মেজাজের একটা গান চালিয়ে রেড ওয়াইন নিয়ে বসে দুজনে | রোদ্দুর ক্লাব ক'রে চিয়ার্স করে, "চিয়ার্স ফর আওয়ার রিলেশনশিপ | উইশ ইট টু বি ইটারনাল |"

বৃষ্টি তার অত্যন্ত প্রিয় একটি গান চালিয়ে ওয়াইন উপভোগ করতে থাকে | রোদ্দুর তাকে আজ হীরের আংটি উপহার দিয়েছে | "কে সারা সারা | হোয়াটএভার উইল বি উইল বি | দ্য ফিউচার ইজ নট আস টু সি | কে সারা সারা | হোয়াট উইল বি উইল বি |" রোদ্দুর হাত ধরে দাঁড় করায় বৃষ্টিকে | স্লো ড্যান্স করতে থাকে দুজনে | গান শেষ হয়ে অন্য গান চলতে থাকে | দুজনে আরো ঘনিষ্ঠ হয় | বৃষ্টির হাত ধরে রোদ্দুর বেডরুমে নিয়ে যায় | একটু অবাক হয় বৃষ্টি, কারণ বৃষ্টি চাইলেও রোদ্দুরই বারবার বলেছে চূড়ান্ত ভালবাসা বিয়ের পর | বৃষ্টির বাড়ি থেকে মানলেও রোদ্দুরের বাড়িতে রাজী করানো বেশ কঠিন | যাইহোক, কিছু বলে না সে |

বেডরুমে দুজনের আলিঙ্গন ক্রমশ দৃঢ় হয় | নেশাগ্রস্তের মতো বৃষ্টি রোদ্দুরকে আঁকড়ে ধরে | লজ্জায় আরক্ত বৃষ্টিকে আদরে আদরে ভরিয়ে দেয় রোদ্দুর | ভালবাসার পর রোদ্দুরকে জড়িয়ে চুপ করে শুয়ে থাকে বৃষ্টি | অনেকক্ষণ পরে রোদ্দুর বলে, 'জানিস ফিরে গেলে ঐ গানটা মনে হবে |'

- কোনটা?

- "এভরি নাইট ইন মাই ড্রিম আই সি ইউ আই ফিল ইউ"

- টাইট্যানিক | সেলিন ডিওন | দারুণ গান |

- হ্যাঁ |

- কেন? আমাদের তো সপ্তাহে চার পাঁচ দিন দেখাই হয় |

- না রে | তোকে একটা কথা বলা হয়নি | বাবা ডেকেছে | একবার বাড়ি যেতেই হবে | শেষ পাঁচ বছরে একবারও যাইনি, ওই ঝামেলাটা হবার পর |

বৃষ্টি জানে ঝামেলাটা তাদের সম্পর্ক নিয়ে | রোদ্দুরের বাড়ি থেকে কিছুতেই মেনে নিচ্ছে না | এই শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মানুষ কত পিছিয়ে আছে চিন্তা ভাবনায় | বেশবাসে নিজেকে বিন্যস্ত করার পর বৃষ্টি প্রশ্ন করে, 'কবে ফিরবি?'

- পরশু যাব আর পরের সপ্তাহে ফিরে আসব | সব মিলিয়ে সাত দিন | দেখিস, এবার সব সমস্যার সমাধান করে আসব |

- সাতটা দিন দেখা হবে না? বাড়িতে গেলে কথাও বলবি না।

- চিন্তা করিস না। হোয়াটস্অ্যাপে অনলাইন থাকব |

মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল | কিন্তু সেটা কাটানোর জন্য বৃষ্টি বলল, 'বেশ, তাহলে আর একবার আদর কর |'

রোদ্দুরের বুকে মুখ ঘষতে থাকে বৃষ্টি | বৃষ্টিকে বুকে জড়িয়ে ধরে রোদ্দুর আবৃত্তি করে, "ম্যায় অওর মেরী তনহাই / অকসর ইয়ে বাতে করতে হ্যায় / তুম হোতি তো ক্যায়সা হোতা / তুম ইয়ে কহতি তুম উও কহতি / তুম ইস বাত পে হয়রাঁ হোতি / তুম উস বাত পে কিতনি হসতি / তুম হোতি তো অ্যায়সা হোতা / তুম হোতি তো উওয়সা হোতা / ম্যায় অর মেরি তনহাই / অকসর ইয়ে বাতে করতে হ্যায় |"

রোদ্দুরের বুকে মাথা রেখে বৃষ্টি বলল, 'হুম, সিলসিলা | রিসাইটেড বাই অমিতাভ বচ্চন | পর ম্যায়তো অভি হুঁ না? প্যার নহি করেগা তু?"

রোদ্দুর আবার বৃষ্টির মধ্যে গলিত হতে থাকে |

ছ'দিন হয়ে গেছে | রোদ্দুর বাড়ি গেছে | বৃষ্টি অফিসের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত | মনটা খচখচ করছে | প্রথম দিন গিয়ে হোয়াটস্অ্যাপ করেছিল, 'পৌঁছে গেছি |' তারপর থেকে আর কোন অনলাইন হয়নি | কাল ফেরার কথা রোদ্দুরের | কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিছুই জানায়নি | মনটা কেমন যেন করছে | অফিস থেকে ফিরে চান করে একটা ব্রীজার নিয়ে ব্যালকনিতে বসে বৃষ্টি | অমাবস্যা রাতের সমুদ্র | ভীষণ উত্তাল |

মুর্শিদাবাদ জেলার ইসলামপুরে বাড়ি রোদ্দুরদের। একটু গ্রামের দিকে। ওর বাবা মা ভীষণ প্রাচীনপন্থী। বৃষ্টিরা চার পুরুষ সাউথ কলকাতার বাসিন্দা। রোদ্দুর ওর ফ্যামিলির মধ্যে অড ম্যান আউট। কি হচ্ছে কে জানে। আগেরবার ওদের সম্পর্কের কথা জানতে পেরে রোদ্দুরের বাবা ভীষণ অশান্তি করেছিলেন। এবার কি হচ্ছে কে জানে! ব্রীজারটা শেষ হতে আর একটা নেয় বৃষ্টি। রাত দশটা। মনে পড়ে চূড়ান্ত ভালবাসার সময়ও রোদ্দুরের সেন্স অফ হিউমার। "চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি তোমায় দেখে ফেলেছি।" আরক্ত হয় বৃষ্টি। আবেশে বিভোর থাকায় খেয়াল করেনি ফোনটা বাজছে পাশে। আননোন নম্বর। একটু ইতস্তত করে ফোন ধরে বৃষ্টি। গ্রাম্য ভাষায় একজন বলে ওঠে, 'আপনি বৃষ্টি ম্যাডাম বলসেন?'

- বলছি।

- আসসালাম ওয়ালেকুম। আমি আসাদ, রফিকুলের বন্ধু।

- রফিকুল? বৃষ্টি এতদিনে ভুলেই গেছে রোদ্দুরের নাম রফিকুল ইসলাম। বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে। ফোনের ওপাশের লোকটি বলে, 'হ্যাঁ, রফিকুল। আমার ছোটবেলার বন্ধু। আপনার সঙ্গে পড়াশোনা করেছেন।"

- হ্যাঁ হ্যাঁ, কী হয়েছে বলুন। বৃষ্টির গলায় উদ্বেগের ছাপ।

কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওপাশ নিরুত্তর। বৃষ্টি আবার বলে, 'কী হ'ল? বলুন না, কেমন আছে রোদ্দুর মানে রফিকুল?'

আসাদ কান্না ভেজা গলায় বলে, 'রফিকুল আর নেই।'

- নেই? নেই মানে? বৃষ্টির ব্রেইন মনে হ'ল ফেল করবে।

- সত্যিই সে আর নেই। তার বাপ তাকে কেটে ফেলেছে।

- কী? কী বলছেন? চিৎকার করে ওঠে বৃষ্টি।

আসাদ যা বলে তার মর্মোদ্ধার করলে দাঁড়ায়, যেদিন সে বাড়ি পৌঁছায় তার একদিন পরে রফিকুলের নিকাহ ঠিক করে ওর বাবা। রফিকুল রাজি হয়নি। ভীষণ রাগারাগি হয়। রফিকুলের আম্মা সামাল দেয়। গৃহবন্দী করে ওর বাবা ওকে। পরের দিন রফিকুল আসাদকে সব কথা বলে ও বৃষ্টির নম্বর দেয়। বলে যদি কিছু ঘটে বৃষ্টিকে খবর দিতে কারণ বৃষ্টি তার ফেরার অপেক্ষায় থাকবে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা রফিকুলের আম্মা বাড়ি ছিল না। ওর বাবা দারু খেয়ে এসে চিৎকার করতে থাকে। বৃষ্টির নামে অশ্রাব্য গালি গালাজ করে। রফিকুল রেগে যায়। ঝগড়া বাড়তে থাকলে রফিকুলের বাবা দা দিয়ে রফিকুলকে... ওর বাবা এখন হাজতে। বৃষ্টির মাথাটা পুরো ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেছে। আসাদের শেষের কথাগুলো মাথায় ঢোকে না। রোদ্দুর, তার রোদ্দুর আর নেই। তাকে "ছোট্ট সাদা হাতি" বলার কেউ নেই। "শেষ পর্যন্ত আমি তোমাকে চাই", কেউ বলবে না। "ম্যায় অওর মেরী তনহাই", কেউ শোনাবে না তাকে।

রাতের সমুদ্রের আকর্ষণ আলাদা। তাও আবার অমাবস্যার রাতের। লাস্ট ব্রীজারটা গলায় ঢালতে গিয়ে চোখ গেল অনামিকায় হীরের আংটিটায়। আটদিন আগে যেটা পরিয়ে বলেছিল, 'ডু ইউ ওয়ান্ট টু ম্যারি মি?' আজ কোথায় তুমি রোদ্দুর? তোমার বাবার পছন্দে তোমার ধর্মের মেয়েকে বিয়ে করতে? চিৎকার করে বৃষ্টি, 'বেঁচে থাকতাম আমি অন্যের চোখের কাজল হয়ে। অন্যের দৃষ্টি দিয়ে দেখতাম তোমাকে দূর থেকে। কোথায় গেলে তোমার বৃষ্টিকে ফেলে? কে শোনাবে গান? কে শোনাবে কবিতা? কেন ফেলে গেলে তোমার বৃষ্টিকে একা?' অঝোরধারায় বৃষ্টি নামে বৃষ্টির দুচোখ বেয়ে।

রাত একটা। রাতের সমুদ্র বড় আকর্ষণীয়। তারপর ভরা কোটালের জোয়ার। কী যেন গানটা ভেসে আসছে? হ্যাঁ, "এভরি নাইট ইন মাই ড্রিম আই সি ইউ আই ফিল ইউ।" আটটা ব্রীজার শেষ। সাঁতার না জানার ভয় আর নেই। ঐ গানটা গুনগুনিয়ে গাইতে গাইতে দরজা খুলে বেরিয়ে যায় বৃষ্টি। সামনে উত্তাল সমুদ্র। গানটা কে যেন গেয়েই যাচ্ছে। আরে! ঐ তো রোদ্দুর। হাসিমুখে তার দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে, "আয় বৃষ্টি ঝেঁপে, ধান দেব মেপে"... সত্যি পারেও ছেলেটা। সমুদ্রের ওপর নাচতে নাচতে দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নির্দ্বিধায় এগিয়ে যায় বৃষ্টি মাঝসমুদ্রে, যেখানে ঢেউয়ের উপর বসে গাইছে রোদ্দুর, "এভরি নাইট ইন মাই ড্রিম আই সি ইউ আই ফিল ইউ..."

একদা এক বাঘের সাথে ...

বলাকা ঘোষাল

অনেকের সাথেই হঠাৎ মোলাকাত হয়ে থাকে | সে অভিজ্ঞতা হয়েছে সবারই | ধাক্কাও লেগে গেছে কখনও | অন্ধকার হলে তো কথাই নেই | আমরা "ও সরি, দেখতে পাইনি" বলেছি | আর নেহাত রাগী মানুষের কাছে "অন্ধ নাকি" পযর্ন্ত শুনতে হয়েছে কাউকে কাউকে | গাড়িও ধাক্কা খায় স্থাবর, অস্থাবর জিনিসের সাথে | কিন্তু বাঘ ভাল্লুকের সাথে ধাক্কা? তাও আবার অনিচ্ছাকৃতভাবে? হুঁ... দেখা গেছে তাও হয়ে থাকে বটে | এই যেমন আমার মামাতো ভাইয়ের সাথে একবার - যাক সে কথা, বলব'খন রয়ে সয়ে |

আমেরিকার অনেক প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জায়গাতেই ভালুকের বড় উপদ্রব | না, তারা ঠিক মানুষখেকো নয় | বরং তারা মানুষের খাদ্যখেকো বলা যেতে পারে | তারা চুইং-গাম থেকে শুরু করে মুড়ি, চানাচুর, পাঁউরুটি, বিস্কুট সব খেতে রাজি | বহুদিন ধরে তারা একটা জিনিস দেখেছে যে মানুষেরা যেখানে চড়ুইভাতি করে চলে যায়, সেখানে ফেলে যাওয়া এঁটো-কাঁটারও দারুণ স্বাদ | কাজেই খুব সাবধান না হলে এদের সাথে হঠাৎ দেখা হওয়াটা একেবারেই অ্যাক্সিডেন্টের পর্যায় পড়ে না | ওরা ভাল করেই জানে যে হাঁউমাউ করে মানুষের পিকনিকের মাঝখানে একবার যদি বডি ফেলে দেওয়া যায়, তো ব্যস্, আর কিচ্ছুটি করতে হয় না | মানুষরা তার চেয়েও বেশী হাঁউমাউ করে সব ফেলে পালিয়ে যায় | তারপর সেখানে বেশ নিশ্চিন্তে বসে পাঁউরুটি চিবনো যায় |

এই মানুষরাই বাড়তি খাবার জঙ্গলে এদিক ওদিক ফেলে যেত এককালে | আর পশুপাখি দেখলে দয়া পরবশ হয়ে খাবার দেয় বলে আরোই এই অবস্থা | আহা খাচ্ছে খাক ভাবার জন্য ভালুক আর রাকুন এই দুই জাত এক্কেবারে আস্কারা পেয়ে মাথায় উঠেছে এখন | তারা এখন জামাই আদর চায় |

নাকখানা এদের অতি চোখা | ঘ্রাণেন্দ্রিয়টি এত টনটনে হওয়াই হয়েছে কাল | টুথপেস্ট, সাবান, সানস্ক্রীন, সবই লুকোতে হয় | ওগুলো আমরা না খেলেও ওরা মানুষের সব সুগন্ধি জিনিসই ভাবে খাবার | অনেক আনাড়ি টুরিস্ট বেড়ানোর শেষে বাড়তি খাবার দিয়েও দিতে চায় এদের | সেই থেকেই শুরু | এদিকে জঙ্গলের অ্যাডভেঞ্চারের শুরুতেই যার খাবার চুরি যায়, তার মহা বিপদ |

খাবার বস্তায় পুরে, মুখ ভাল করে বেঁধে উঁচু গাছের ডালের সাথে ঝুলিয়ে রাখতে হয় | সরকারী ব্যবস্থায় বেশ কিছু জায়গায় স্টীলের সিন্দুক বানানো আছে যা ভালুকদের খোলার ক্ষমতা নেই | গাছের মগডালে পুটলি বাঁধতে এলেম দরকার |

মানুষের হাত থেকে খাবার কেড়ে নিতে গিয়েই এমন আহত করে ফেলে যে বলবার নয় | ইচ্ছাকৃত হয়তো নয় | একছড়া মর্তমান কলার মতন নখের বাহার দেখলে বোঝা যায় তার আলতো বুলনো আমাদের ননীমার্কা চামড়ার কী হাল করতে পারে | ভালুকটা হয়তো "এই, ভাগ এখান থেকে," বলে থাবা দিয়ে একটু মারল ঠেলা... | ব্যস্, ওই ঠেলাতে প্রাণপাখিই হয়তো উড়ে গেল | অথবা বেঁচে থাকলে বাকি জীবনের মতন জঙ্গল-ভীতি হয়ে গেল |

এ তো গেল মানুষকে টেক্কা দিয়ে তার খাবার দখল | মানুষই যদি খাবার হয়, তাহলে তো কথাই নেই | তাকে কেন্দ্র করেই পশুরা ছুটে আসবে | আর তখন ধাক্কা থেকে অক্কা! বেঁচে কেউ কেউ ফিরেছে হয়তো | সে গল্প বিরল |

কিন্তু অনিচ্ছাকৃত ধাক্কা? সত্যিকারের অ্যাক্সিডেন্ট! তাও আবার বাঘের সঙ্গে? সেও কিনা আবার আমার আত্মীয়! এক্কেবারে খোদ মামাতো ভাই!

একটা প্রমাণ সাইজের বাঘের সাথে কেবল স্লাইট একটু ধাক্কা | মানে যে সে ধাক্কা নয় যে, "ও সরি, দেখতে পাইনি, আপনার লাগেনি তো?" বলে চলে যাবে | নোপ! এ একেবারে হিন্দিতে যাকে বলে টক্কর | একেবারে হেড-অন্ কলিশন্!

সেটা খুব সম্ভবত ১৯৯৩ সাল | নীলগিরি পাহাড়ের কফির বাগানের ম্যানেজমেন্টে ছিল আমার সেই সদ্য কলেজ পাস করা ভাই | মামার বাড়িও ওয়েলিঙ্গটনে, খুব দূরে নয় | ক্রীস্টমাস আর নতুন বছরকে ঘিরে বড় সাহেবের বাড়িতে সেদিন রাতে পার্টি | হিমেল রাত, প্রচন্ড ঠান্ডায় মোটর সাইকেলে চড়ে পাহাড়ের মাথায় ম্যানেজারের বাংলোতে যাবে বলে অনেক প্রস্তুতি নিয়েছে | শার্টের তলায় গেঞ্জি, উপরে সোয়েটার | আর সবার উপর পুরু চামড়ার জ্যাকেট | পায়ে শুধু একটা গরম টেরি উলের প্যান্ট | এমন জব্বর গরম যে ওটা একাই একশ | তলায় ইনার পরবার আর দরকারই হয় না | হাতে মোটা চামড়ার গ্লাভস্ | মাথায় মোটা উলের টুপি আর মাফলার | ব্যস্, শীতের বাবাও হার মানতে বাধ্য |

এবার খোকা পথে | যাঁরা নীলগিরিতে গেছেন তাঁরা সেখানকার হেয়ারপিন-এর মতন পাক খাওয়া পাকদণ্ডীর সঙ্গে পরিচিত | গোঁ গোঁ করে একের পর এক হেয়ারপিন ট্যাকেল করে চলেছে | অন্ধকার নেমে এল নিমেষে |

যেই না একটা হেয়ারপিন-এ প্রায় ২৯০ ডিগ্রী ঘুরেছে, ব্যস্, কী যে ঠিক হ'ল ও টেরও পেল না | নিঃশব্দে কী যেন একটা পড়ল হাতের উপর | মুহূর্তে সব নিরেট অন্ধকার | তারপর সব অন্যদের রিপোর্ট থেকে পাওয়া |

পাহাড়ের উপরে ম্যানেজারের বাংলো থেকে একজন মালী দিনের শেষে বাড়ি ফিরছিল সাইকেলে | মনে হ'ল যেন একটা যান্ত্রিক শব্দ কোথা থেকে ভেসে আসছে | অথচ পথে আর কেউ নেই | পাহাড়ী মানুষের কাছে এটা বিপদের সঙ্কেত | নিশ্চয়ই কেউ খাদে পড়ে গেছে | সাইকেল থেকে নেমে এক হাত লম্বা চার-সেলের ব্যাটারীর টর্চ ফেলে ফেলে দেখতে লাগল আওয়াজ অনুসরণ করে | ঠিক যা ভেবেছে তাই | রক্ষে খাদ গভীর নয় | দেখতে পেল উল্টে যাওয়া মোটর সাইকেলটা | চাকা তখনও বনবন করে ঘুরছে | বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে নতুন ম্যানেজারবাবু, জখমের চিহ্ন সাংঘাতিক |

সেল ফোন তখনও সভ্যতার কল্পনায় | পাঁই পাঁই করে সে ছুটল ম্যানেজারের বাড়ি | সেখানে পার্টি উঠল মাথায় | সারারাত অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, বাড়িতে খবর পাঠানো | বছরের শেষ দিনে হাসপাতালেও একটু ছুটির হাওয়া | স্কেলেটাল স্টাফ্ দিয়ে কাজ চালানো | কাজেই সেখানেও হইচই |

এক্সপার্টদের মতে বাঘ বেচারাও ততটাই চমকেছে আর ঘাবড়েছে | দিব্যি উপরের রাস্তা থেকে সে এই রাস্তায় আলতো ভর দিয়েই নীচের উপত্যকার দিকে লম্ফ মারবে এরকম একটা প্ল্যান ভেঁজে দিয়েছিল মস্ত এক লাফ | পাহাড়ের আড়ালে থাকা মানুষের এই যানটি যে এত কাছে সে স্বপ্নেও ভাবেনি |

ভাই বেমালুম সেখানেই হাজির | ব্যস্... মোটরসাইকেল, মানুষ, বাঘ মিলে জাপ্টাজাপ্টি করে বার দুই পালটি | সেটা আর ভাই টের পায়নি | হ্যান্ডেলের উপর বেমক্কা এক বস্তু এসে পড়া মাত্রই সে কাত | ক্ষতচিহ্ন দেখে বোঝা গেল যে পাল্টি-শেষে ভাই ছিল নীচে, বাঘটি উপরে | বাঘ বেচারা তো ভয়ে আপন প্রাণ বাঁচা বলে ছুট | শুয়ে থাকা মানুষটার ওপর ভর দিয়ে হুড়মুড় করে উঠতে গিয়েই হ'ল মুশকিল |

হেলমেটের কল্যাণে মাথাটা গেল বেঁচে | শরীরের উপরের অংশে বহুস্তর জামাকাপড় | সেসব ভেদ করে বাঘের নখ ওর চামড়া অবধি পৌঁছাতে পারেনি |

কিন্তু ওই একস্তর টেরিউল? ওই পেল্লাই বাঁকা নখের কাছে সে তো ফিনফিনে কাগজ | আর শুধু কি প্যান্ট? মাখনের মতন থেঁতলে গেল দুটো উরুর পেশি, শিরা, উপশিরা |

তারপর আর কী? মাসখানেক হাসপাতাল, তারপর মাস দুই তিন রোজ হাসপাতালে হাজিরা ড্রেসিং-এর জন্য, কিছু স্কিন গ্র্যাফটিং, আত্মীয় স্বজনের নানারকম সহানুভূতি | আরও বহু রকমের চিকিৎসা, ফিজিও-থেরাপি |

বিপদ কেটে যাওয়ার পরে, আমরা ভাইবোনেরা চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে কতকটা গর্বিতও বটে | হুঁ হুঁ, যে সে দুর্ঘটনা তো নয়! আমাদের পরিবারের মান রেখেছে এই পুত্র | এক্কেবারে বাঘের সাথে আলিঙ্গন, গড়াগড়ি! বীর বটে! পাঁচজনকে বলেও আরাম | প্রকৃতির দয়ায় মশা, মাছি, আরশোলা, বোলতা কত কিছুরই সন্মুখীন হতে হয় | সে আর বলার মতন কী? চারপেয়ে শিকারী জন্তুর চাপে পড়েও যে বাঙ্গালের পোলা বিজয়ী, সেটাই বাজিমাত!

যদিও সত্যি কথা কবুল করতে বাধা নেই | অজান্তে টক্কর বলেই ওই যাত্রায় ছাড়া পেয়ে গেল ও | ডাক্তারের মতে বাঘের যদি একটুও নজর থাকত ওর উপর তাহলে কপালের উপর আর ভরসা করা সম্ভব হত না কোনওমতে |

শেষটা ভাল হলেই কমেডি | জীবনের কোনও আনন্দ বাদ যায়নি এই ভাইটির | সুখ, সাফল্য সবই ছপ্পড় ফাড়কে! ঠিক কপাল আর নাক ঘেঁষে যেই বাঘটা পড়েছিল, তার কপালও আশাকরি নেহাত মন্দ হয়নি | বাঘ মহলে পাঁচজনকে বলে বেড়ানোর মতনই | মোটরসাইকেলের সাথে টক্কর কটা বাঘেরই বা কপালে জোটে!

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে

কৃষ্ণা গুহ রায়

আজ মেসেঞ্জারে একটা ছোট্ট লেখা পেলাম | কেমন আছ চারু? ভাল করে প্রোফাইলটা খুলে দেখলাম পলাশ মন্ডল অধিকারী | এক বিস্তর ব্যবধানে দুজন মানুষের সাক্ষাৎ হ'ল আবার ফেসবুক-এর কল্যাণে|

পলাশ, তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ, কেমন আছি? তা বলতে পারো বেঁচে আছি| বয়স বেড়েছে, মাথার চুল অনেকটাই পাতলা হয়ে গেছে, ওজন বেড়েছে | সে তো ছবি দেখেই বুঝেছ | তোমার দেখা চারু আর নেই | বয়ঃজনিত অনেক পরিবর্তনই তোমার মধ্যে এসেছে তা তোমার ছবিতেও দেখলাম|

আজ সকালে উঠে দেখলাম মেঘলা আকাশ | তোমার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটা খুব মনে পড়ছে | আমরা দুজনেই শান্তিনিকেতনের প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রী | বিষয়টা শুধু আলাদা, আমার আর্টস আর তোমার সায়েন্স|

তোমার মনে পড়ে পলাশ, বসন্ত উৎসবের দিনে শান্তিনিকেতনে কলাভবনের সামনে বাসন্তী রঙের লালপেড়ে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে ছিলাম আমি? খোঁপায় পলাশফুল গোঁজা ছিল আমার | তুমি দূর থেকে আমাকেই দেখছিলে|

জানি না আজও মনে আছে কিনা তোমার, শান্তিনিকেতনের সেইসব দিনগুলোর কথা|

রবীন্দ্রনাথ বসন্তের মধুমাস ফাল্গুনকে এক অন্য চেতনায় আমাদের হৃদয়ে স্থান করে দিয়েছেন | ঋতুরঙ্গশালায় ফাল্গুন মোহময়ী আনন্দে অনুপমা | নান্দনিক বিভাসে কবি তোমার আমার অন্তরে ফাল্গুনকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন | বসন্তের যে গান ফাল্গুনের নবীন আনন্দে হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে ওঠে, এই শান্তিনিকেতনী বসন্তের আনন্দের নবীনতাকে হৃদয় দিয়ে আমি অনুভব করেছিলাম | আর সেই সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলাম তোমাকে|

এই কারণেই বোধহয় ঋতুরাজ বসন্ত ভালবাসার দূত, নবীনের সঞ্জীবনী, আর প্রবীণের স্মৃতিমেদুর|

জানো তো, তাৎক্ষণিকভাবে যাকে ভাল লেগে যায়, তাকে সহসা কিছু বলতে বা তার সঙ্গে আলাপ করতে দ্বিধা লাগে | সেদিন তোমার বন্ধুরা তোমার কপালে যখন আবীর মাখিয়ে দিল, আমি তখন ভরসা করে এগিয়ে গিয়ে যখন আমার আবীরমাখা হাতখানা তোমার কপালে বুলিয়ে দিলাম, কী অদ্ভুত এক শিহরণ জেগেছিল মনে | একে ভালবাসা বলা যায় না, একে ভাললাগা বলা যায় না, এটা অন্য এক ধরনের অনুভূতি | খুবই তাৎক্ষণিক, কিন্তু তার অনুরণন চলে দীর্ঘ সময় ধরে|

অবশ্য তোমার হাতের ছোঁয়া আবীর যখন আমার দুটো গাল কপালে উষ্ণতার ছোঁয়া দিল, তখন তোমাকে খুব পরিচিত মনে হয়েছিল | পৃথিবীর কিছু কিছু মানুষকে প্রথমবার দেখলেই মনে হয় যেন কতদিনের চেনা|

বিকেলবেলা যখন হঠাৎ করে আবার সঙ্গীত ভবনের সামনে তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন পরিচয়পর্ব দীর্ঘ হ'ল বটে, কিন্তু সেই প্রথাগতভাবে আপনি দিয়ে শুরু করেছিলে | তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনির চৌকাঠ পার হয়ে তুমি আমার মনের অন্তরমহলে প্রবেশ করলে|

তোমার মনে পড়ে পলাশ, তুমি বলেছিলে শীতের বিদায় আর বসন্তের আগমন যখন দখিনা সুরে বইতে আরম্ভ করে তখন অনেক ফুলের ডালি সাজিয়ে মাধবী ফুলই নাকি কবিকে প্রথম ডাক দিয়েছিল|

আর আমি তোমাকে বলেছিলাম - তুমি কি জানো এই সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন?

তুমি তখন চুপকরে ছিলে | আমি বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "হে মাধবী, দ্বিধা কেন?"

তারপরে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলে বনপুলক?

বনপুলক এরা হ'ল বসন্তের প্রথম দূতী | বসন্তের এই ফুল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "এখানকার লোকের কাছে তার নাম জিজ্ঞেস করলে বলে বুনোফুল - নাম জানা নেই | আমরা সেই অনাদৃত ফুল জঙ্গল থেকে আনিয়ে কিছুকাল আগে বাগানে লাগিয়েছিলুম, এখন তার পুরস্কার পাচ্ছি| সৌন্দর্যে ও সৌগন্ধে তারা কৃতজ্ঞতা বিস্তার করেছে | আমি এর নাম দিয়েছি বনপুলক |"

এরপর তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে - তুমি জানো রামধনু চাঁপাফুলকে কবি আদর করে কী নামে ডাকতেন?

আমি বলেছিলাম - জানি, রামধনু চাঁপাফুলকে রবীন্দ্রনাথ আদর করে নাম রেখেছিলেন - "বাসন্তী"|

শান্তিনিকেতনে তোমার আমার জীবনের সমস্ত সংলাপ আজও স্মৃতির ঘরে লালন করি। মনে পড়ে পলাশ, রোজ বিকেল বেলায় সব বন্ধুদের চোখে ধুলো দিয়ে ভুবনডাঙার দিকে আমরা বেড়াতে যেতাম। এক অমোঘ টানে আমাদের দেখা করাটা জরুরী ছিল। না হলে মনের কথা মনে মনে কানাকানি করতে না পারলে আমরা দুজনেই তৃপ্তি পেতাম না।

কিছুদিনের মধ্যেই তুমি আর আমি আরও কত কাছাকাছি চলে এলাম। সবসময় আমরা নির্জনতা খুঁজতাম। তাই প্রায়ই চলে যেতাম কোপাই নদীর ধারে।

মনে আছে, গ্রীষ্মের দুপুরে কোপাই নদী কীরকম কৃপণ হয়ে যেত! আবার বর্ষায় যেতাম কোপাইয়ের গর্ভবতী রূপ দেখতে। একদিন আকাশ জুড়ে কালো মেঘ। হঠাৎ এসে গেল বৃষ্টি। এমন সময় কড়কড় করে বাজ পড়ল দূরে কোথাও। আমি ভয়ে তোমাকে আঁকড়ে ধরলাম। এমন সময় ঈশান কোণ থেকে উড়ে আসা একটা মেঘ তোমার আমার ভালবাসাকে অতলান্তিক গভীরতায় পৌঁছে দিল।

একসময় তোমার আমার ভালবাসার মধ্যে প্রাচীর তুলে দাঁড়াল জাতপাতের গোঁড়ামি। আমি গোঁড়া ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা, তুমি তপশীলি জাতিভুক্ত। একপ্রকার অবস্থার চাপেই আমাদের দুজনের ভালবাসাকেই হৃদয়ের শান্তিনিকেতনে রেখে চিরদিনের জন্য আলাদা হয়ে যেতে হ'ল।

আমার এখন স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখের সংসার। তবু মাঝে মাঝে বড় একা লাগে। একমাত্র সন্তান সেও থাকে বিদেশে।

পলাশ, আজও কি তুমি আমাকে ভালবাস? এতদিন পর হঠাৎ ফেসবুক-এ তোমার ছোট্ট জিজ্ঞাসা কেমন আছ? সত্যি বলছি প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় এসে মনে হয় আমি সত্যি তোমাকে চেয়েছিলাম, কিন্তু...

পলাশ, তুমি তো প্রেমিক। অমল স্বপ্নের বারান্দায় তোমার চারু কি আজও আনাগোনা করে? বড় জানতে ইচ্ছে করে।

পলাশ, আমি এখন শুধু সময়ের জাল বুনি। আর হৈমন্তী বিকেলের মতো ক্ষয়ে ক্ষয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যাই। উদাস আদিগন্ত শস্যশ্যামলা ভূমির আলপথ বেয়ে মহাশূন্যের দিকে এগিয়ে চলি তোমায় নতুন করে পাব বলে।

আর মনে পড়ে কোপাইয়ের ধারে বসে তুমি যে গানটা আমাকে প্রায়ই শোনাতে - "দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের

আশুবাবুর প্রেম

শুভা আঢ্য

সারাটা দিন যেমনই কাটুক না কেন, সূর্যের আলোটা পর্দার বাঁদিকে সরে গেলেই আশুবাবুর মনটা খুশি খুশি হয়ে ওঠে। কে যেন বলতে থাকে, "এবার আসবে, আর দেরি নেই, দেরি নেই!" চটকরে জানলার কাছে গিয়ে রাস্তার দিকে দেখতে থাকেন তিনি। মধ্যবিত্ত পাড়াটা সবসময়েই ব্যস্ত। মানুষজনের আসা যাওয়া তো আছেই, হুশ হুশ করে গাড়িও বেরিয়ে যায় এদিক ওদিক। ইস্কুল ফেরতা একদল ছোট ছেলে মেয়ে কলকল করতে করতে একসঙ্গে রাস্তার পাশ দিয়ে আসে, আবার দলছুট একটা দুটো এদিক ওদিকেও ছিটকে যায়। মোটাসোটা একটি মানুষ কারোকে ভারী গলায় ডাকে। অস্পষ্ট উত্তরও শোনা যায় আশুবাবুর তিনতলার খোলা জানলা থেকে। কিন্তু এসব দেখাশোনার উৎসাহ থাকে না তাঁর। মন পড়ে থাকে রাস্তার ঠিক মোড় ঘোরার কোণটিতে। কোনদিন হয়তো সঙ্গে সঙ্গেই, আবার মাঝে মাঝে বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষার পর দেখতে পাওয়া যায় ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসা শাড়ির আভাস, কোনদিন আকাশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নীল, কখনো দিনের শেষের সূর্য রশ্মির মতো জ্বলন্ত কমলা কিংবা ভোরের শিশিরের মতো সাদা। অন্য কেউ করে করুক, আশুবাবুর এসব উপমা-টুপমা নিয়ে কবিত্ব করার অভ্যাস নেই, তাঁর চোখে সবই সুন্দর লাগে। তিনি গভীর আগ্রহে দেখতে থাকেন শাড়ির অধিকারিনীকে। একটু কাছে এলে চোখে পড়ে তরুণী মেয়েটিকে। কাঁধের একদিকে লম্বা বিনুনি, অন্যদিকে চামড়ার ব্যাগের স্ট্র্যাপ। বাঁহাতে মোটা মোটা দুটি বই বুকের কাছে ধরা। আশুবাবু আর একটু ঝুঁকে দেখতে থাকেন, আর ঠিক রোজকার নিয়মমতো জানলার নিচে এসেই মেয়েটি ডান হাতটি তুলে আশুবাবুকে জানান দেয়, 'আমি এসেছি।' আশুবাবুর মুখে হালকা হাসি ফুটে ওঠে, হাত তুলে তিনিও জানান দেন, 'দেখো আমিও আছি।'

আশুবাবু আর মেয়েটি একই অ্যাপার্টমেন্ট বাড়িতে থাকেন। আশুবাবু তিনতলায় আর মেয়েটি পাঁচতলায়। আশুবাবুর বাড়িতে মা, বাবা আর বোন। মেয়েটির নাম শমিতা, সে একাই থাকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। ক্লাসের শেষে রোজই সে এই সময়ে বাড়ি ফেরে। আশুবাবু এবার জানলা ছেড়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সিঁড়িতে পায়ের উঠে আসার শব্দ শুনতে থাকেন, যতক্ষণ না সে শব্দ তাঁদের দরজা পেরিয়ে আরো ওপরে উঠে যায়।

শমিতা নিজের অ্যাপার্টমেন্টে এসে চাবি দিয়ে দরজা খোলে। সারাদিনের কাজের শেষে পাঁচতলা উঠে আসার পরিশ্রমে একটু ক্লান্তির ছাপ ওর মুখে। ভিতরে এসে দরজা বন্ধ করে, হাতের বইগুলো আর কাঁধে ঝোলানো লাল ব্যাগটা সোফার সামনে গোল টেবিলের ওপর রাখে। পায়ের জুতো খুলে, কোট ক্লসেটে রেখে, নরম একজোড়া চটিতে পা গলিয়ে রান্না ঘরের দিকে পা বাড়ায়। শমিতার অ্যাপার্টমেন্টটি নেহাৎই ছোট্ট। শোবার ঘর, বসার ঘর আর এক চিলতে একটি রান্নাঘর, এই। ঘর বলে যাদের গৌরবান্বিত করা হচ্ছে তাদের ঘর না বলে বড় বাক্স বললে বরং ঠিক মানায়। না হলেই নয় এমনি কটি আসবাবেই মনে হয় পা ফেলবার জায়গা নেই। রান্নাঘরও তথৈবচঃ! একজন ঢুকলে আর তার মধ্যে কারো জায়গা পাওয়া মুশকিল। তবে, গ্র্যাজুয়েট ছাত্রীর জন্য নিউ ইয়র্ক শহরে এইই রাজপ্রাসাদ! দেশ থেকে এসে স্কলারশিপের ডলারকে টাকায় রূপান্তরিত করতে গেলে দম আটকাবার জোগাড় হত প্রথম প্রথম। শমিতার তাই নিজের এই ছোট্ট আবাসটিকে নিয়ে কোনো আক্ষেপ নেই। তার পাড়া-পড়শিরাও বেশ মিশুকে। শমিতার অ্যাপার্টমেন্টের সরু লম্বা জানলায় রঙিন পর্দা, সোফার দুপাশে পর্দার সঙ্গে ম্যাচ করা দুটি কুশন, দেওয়ালে টাঙানো সুদৃশ্য ছবির প্রিন্ট, সোফার পাশের টেবিলে ফুলের গুচ্ছ, হোক না কেন প্লাস্টিকের! শোবার ঘরে, বিছানায় সুন্দর বেডকভার, পড়ার টেবিলের ওপর বুক কেস, বিছানার পাশে ছোট্ট একটি টিভি সেট।

রান্নাঘরের ফ্রিজ থেকে একটা coke-এর ক্যান নিয়ে সোফায় বসে চিঠি খোলায় মন দেয় শমিতা। ইউনিভার্সিটির দুটো কাজের চিঠি ছাড়া আর সব ফালতু। বাড়ির বা বন্ধুদের কোনো চিঠি না দেখে একটু মনক্ষুণ্ন হ'ল শমিতা। কতদিন দেশের বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া হয়নি! ওহো, একটা কথা বলা হয়নি আপনাদের - সময়টা ১৯৭০ সাল। তখন নেই ইন্টারনেট, ফেসবুক, স্মার্ট ফোন, হোয়াটস্অ্যাপ! নাঃ, এত বড় বড় চোখ না করে গল্পটা শুনুন। হ্যাঁ রে ভাই, তখনও প্রেম হত, শুনুনই না একটু ধৈর্য্য ধরে!

শমিতা হাত ঘুরিয়ে সময় দেখে। ছটা বাজে! আর তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজায় টুক টুক টুক শব্দ শোনা যায়। শমিতার মুখে একটু হাসি ফুটে ওঠে। দরজা খুলে দিতেই একমুখ হাসি নিয়ে

আশুবাবু ভিতরে এসে সোফায় বসে পড়েন ও পাশের জায়গা দেখিয়ে বলেন - বসো | শমিতা বলে - দাঁড়াও আগে কি খাবে বলো? তারপর বলে - বলতে হবে না, আমি জানি | তারপর কিচেন থেকে নিয়ে আসে একটি সুন্দর কাপে, প্রায় উপচে পড়া আইসক্রিম | আশুবাবুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে | বলেন, কী করে তুমি জানলে আজ সত্যিই আমার আইসক্রিম খেতে খুব ইচ্ছে করছিল? শমিতা আশুবাবুর কাছে এসে বসে বলে, আমি তোমার মুখ দেখলেই বুঝতে পারি | এরপর ওরা নিজেদের কথায় মগ্ন হয়ে যায় |

এমনি করেই ওদের সময় কাটে | কখনো আশুবাবু শমিতার ছবি আঁকেন | শমিতা দুষ্টুমি করে বলে, ওটা মোটেও আমার ছবি নয় | অন্য কার ছবি এঁকেছ | আশুবাবুর নিজে ভাল আর্টিস্ট হিসেবে বেশ গর্ব আছে | এরকম অন্যায়কে মেনে নিতে তাঁর সম্ভ্রমে বাধে | নেহাৎ শমিতা, তাই প্রথমে নানাভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন, আর শেষে কিছুতেই না পেরে যারপরনাই রাগান্বিত হয়ে চলে যেতে চান | শমিতা হাত ধরে থামায়, আদর করে, ক্ষমাও চায়, তবেই সেদিন মিটমাট হয় | এক একদিন টিভি দেখতে দেখতে আশুবাবু সোফাতেই ঘুমিয়ে পড়েন | শমিতা আশুবাবুর ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে | ওঁকে জাগিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না ওর, তবু জাগাতে তো হয়ই | শমিতার হাতটা জড়িয়ে ধরে ঘুম জড়ানো চোখে আশুবাবু বলেন, আমার যেতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু! শমিতা কী বলবে ভেবে পায় না | ইচ্ছে করে এমনি করেই বসে থাক, কিন্তু তাই বা হয় কেমন করে? শমিতা তো ওঁর মতো অবুঝ হতে পারে না!

সময় বয়ে যায় | গ্রীষ্ম চলে গিয়ে শরৎ এসে নিউ ইয়র্কের আকাশের প্রাঙ্গণে রঙিন ছবি ছড়িয়ে দেয় | সেন্ট্রাল পার্কে হিমেল হাওয়া খেলা করে শমিতার চুলের সঙ্গে | আশুবাবুর হাত শমিতার দস্তানা পরা হাতের গরমে জড়িয়ে থাকে | বেড়িয়ে ফেরার পরে শমিতার বাড়িতে হট চকলেটের সঙ্গে সুগার কুকি খেতে খেতে আশুবাবু চুপ করে দেখেন শমিতা পড়ার টেবিলে হাতের বইটিতে মগ্ন হয়ে আছে | উনি জানেন এ সময়টা সে এক অন্য জগতে আছে | এ সময়ে তাকে পাওয়া যাবে না | তবু তো সে আছে, এই একই ঘরে, এত কাছে, এর বেশি আর না চাওয়াই ভাল | আশুবাবুও নিজের বইতে মন দেন | ঘরে শুধু ঘড়ির টিক টিক আওয়াজ | বাইরে অন্ধকার নেমেছে ঘন হয়ে | হঠাৎ দরজার বেল বাজতে শমিতা ও আশুবাবু দুজনেই চমকে ওঠে | শমিতা দরজা খুলতেই হৈ হৈ করতে করতে ঢুকে পড়ে জনা তিনেক যুবক | এদের মধ্যে দুজন আশুবাবুর চেনা, রাহুল আর কিরণ | এই বাড়িরই তিনতলার বাসিন্দা, কিন্তু তৃতীয়জনকে তিনি চিনতে পারলেন না | রাহুল আর কিরণ এসে আশুবাবুর দুপাশে জমিয়ে বসে বলল, কী আশুবাবু, কী খবর আপনার? শমিতা বহেনজির দেখভাল কেমন চলছে? সব ঠিকঠাক তো?

শমিতার কাজের সময় এদের আসাটা আশুবাবুর মোটেই ভাল লাগছিল না | তিনি কোনো জবাব না দিয়ে শুধু একটু ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন | তাই দেখে রাহুল নিচু গলায় কী একটা বলল; আর সে কথা শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল | শমিতা, আশুবাবুর কাছে এসে বলল, তোমরা চুপ কর তো, আশুবাবু আমার প্রিয় বন্ধু, তা জানো? ওরা সবাই বলে উঠল, জানি যে, আরে ভাই, সেটাই তো আমাদের সবার বিশেষ চিন্তা! আবার হাসির হুল্লোড় উঠল |

শীত এবার যেন হুট্ করে এসে গেল | আজকাল শমিতার ফিরতে ফিরতে দিনের আলো নিভে যায় | আশুবাবুর ভাল লাগে না ওর এত দেরী করে ফেরা | কিন্তু শমিতা বলেছে তার কাজ থাকে | আজকাল আবার শনিবার আর রবিবারেও মাঝে মাঝে শমিতা থাকে না বাড়িতে | জিজ্ঞেস করলে বলে, কি করি বলো, মাস্টারমশাইরা এত কাজ দেন আর ওগুলো ওখানে বসেই শেষ করতে হয় | আবার বলে, আমার ভাল লাগে না এত কাজ করতে, এই তো আর কিছুদিন পরে পরীক্ষা হয়ে যাবে, তারপর তুমি আর আমি অনেক সময় কাটাব একসঙ্গে | শুনে খুশি হন আশুবাবু | শীতের ছুটিতে আশুবাবু কিছুদিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখলেন, শমিতার নতুন বন্ধু, ওই জিৎ নামের লোকটা প্রায়ই বেড়াতে আসে শমিতার বাড়িতে |

শীত চলে গিয়ে নিউ ইয়র্কে বসন্ত হুড়মুড়িয়ে এসে গেল | সেন্ট্রাল পার্কে হলুদ ড্যাফোডিল সবুজ ঘাসের কোলে দোলে, লেকের জল টইটুম্বুর, তাতে সাদা সাদা রাজহাঁস রাজকীয় মহিমায় ভেসে বেড়ায় | আর ভেসে বেড়ায় ছোট ছোট নৌকো যাতে চড়ে বেড়াতে আশুবাবুর খুব ভাল লাগে | শমিতার সঙ্গে গেছেনও কয়েকবার | ইদানীং শুধু একটাই সমস্যা দেখা দিয়েছে; তিনি যে দিনই শমিতার সঙ্গে নৌকো চড়তে যান, সেদিনই কী করে যেন শমিতার ওই নতুন বন্ধু ঠিক এসে হাজির হয় | এমনিতে লোক খারাপ নয়, নৌকো চালায়, সবাইকে

আইসক্রিম খাওয়ায়, কিন্তু তবুও আশুবাবুর কেমন যেন ভাল লাগে না | কেন যে শমিতার এই লোকটাকে ভাল লাগে, তিনি ভেবে পান না |

এমনি করেই কাটল আরও দুটো বছর | শমিতার পড়াশোনা প্রায় শেষ তবে আশুবাবুর কাজ একটু বেড়েছে তাই শমিতার সঙ্গে দেখাশোনাটা একটু কমেছে | রোজ আর যাওয়া হয় না, তবে সপ্তাহ শেষে একবার নিশ্চয়ই দেখা হয় | আশুবাবুর কাছে তাই অনেক! একদিন সেই রকমের একটা সন্ধ্যেবেলা শমিতা আশুবাবুকে বলল একটা সারপ্রাইজ আছে, শুনবে? আশুবাবুর সারপ্রাইজ বেশ পছন্দ | তিনি খুশি হয়ে শমিতার দিকে তাকালেন | শমিতা বলল, জানো আশুবাবু, আমি ঠিক করেছি এবার বিয়ে করে ফেলব | আশুবাবু বিয়ের ব্যাপারটা ঠিক সারপ্রাইজের পর্যায়ে ফেলেন না, তবু জিজ্ঞেস করলেন, কেন? শমিতা বলল, একলা একলা আর ভাল লাগছে না তাই | উত্তরটা আশুবাবুর কাছে ঠিকই মনে হ'ল, তাই জিজ্ঞেস করলেন, কাকে? শমিতা একটু থেমে বলল, ওই আমাদের বন্ধু জিতকে, ওকে তো তোমার ভাল লাগে, তাই না? জিৎও তো তোমাকে খুব পছন্দ করে | ও এরপর এখানেই থাকবে, আমরা একসঙ্গে বেড়াতে যাব, গল্প করব, বেশ ভাল হবে তাই না?
জিতকে! বিয়ে করবে? সে এখানে এসে থাকবে? এ আবার একটা কথা হ'ল? আশুবাবু সোজা হয়ে বসে শমিতাকে বললেন, না, আমি তোমার সঙ্গে থাকব, আমিই তোমাকে বিয়ে করব | শমিতা আশুবাবুর হাত ধরে বলে, তা তো হবে না আশুবাবু, আমি তোমাকে খুবই ভালবাসি কিন্তু বিয়ে তো করতে পারব না | আশুবাবুর কাছে এসব কথা খুবই গোলমেলে ঠেকে | ভালবাসি কিন্তু বিয়ে করতে পারব না, কেন রে বাবা?

প্রেমের গল্পটা কি আপনাদেরও একটু ধাঁধায় ফেলছে? না ধরে ফেলেছেন? আচ্ছা বলেই দিই | আশুবাবু এখন সবে পাঁচ বছরে পা দিয়েছেন | আর শমিতা গ্র্যাজুয়েট স্কুল প্রায় শেষ করে এনেছে | তিন বছর বয়স থেকে আশুবাবু শমিতার প্রেমে পড়েছেন | আর সে প্রেম দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে | তাঁর কাছে এর অন্য কোনও ব্যাখ্যা নেই | তাঁর কাছে এর চেয়ে বড় সত্যিও কিছু নেই | শমিতা সাইকোলজির গবেষক, সে জানে শিশুদের জগতে ঘোরপ্যাঁচ নেই, সবকিছুই সোজাসুজি | তারা যা অনুভব করে তা লুকোতে জানে না | কাজেই সে আশুবাবুর কথা হেসে উড়িয়ে না দিয়ে, বোঝাবার চেষ্টা করে | আশুবাবু সেদিন যাবার সময় গম্ভীর হয়ে চলে যান | তারপরও আসা-যাওয়া যে বন্ধ থাকে তা নয়, তবে জিৎ যেদিন উপস্থিত থাকে সেদিন আশুবাবু বাড়ি যেতে চান তাড়াতাড়ি | জিৎ যতই চেষ্টা করে তাঁর মন পেতে ততই আশুবাবু সরে যান | শমিতাকে জিত হাসতে হাসতে বলে - বাপরে, এ রকম কঠিন প্রতিযোগিতা থাকবে জানলে হয়তো একটু চিন্তা করতুম, এগোব কিনা? শমিতা বলে - আহা, আমার আশুবাবুর কথাটাও ভেবে দেখো, বেশ চলছিল সব, মাঝখান থেকে তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসলে | এসব মানিয়ে নিতে একটু সময় লাগবে বৈকি! বিয়ের পর, জিৎ এ বাড়িতে থাকতে শুরু করলে আশুবাবু আরোই চুপচাপ হয়ে গেলেন | আশুবাবুর অবশ্য কিন্ডারগার্টেনে অনেক ব্যস্ততাও বেড়েছে, তাই অবসরও তেমন নেই তাঁর | শমিতাও পড়াশোনা ঘর-সংসার, জিৎ ও তার বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, আশুবাবুর খোঁজখবর আর তেমন করে ওঠা হয় না | এর মধ্যে শমিতার কোলে আসে ছোট্ট মুনিয়া | আশুবাবু মায়ের সঙ্গে হাসপাতালে গিয়ে সুগম্ভীর মতামত দেন - বড্ড আওয়াজ করে বেবি, ওকে হাসপাতালেই রেখে যেও | সবার উচ্ছ্বসিত হাসির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তুচ্ছ করে আশুবাবু মাকে বলেন - বাড়ি চলো |

এবার একটু fast forward করা যাক | কিছুদিন পরে শমিতা ও জিৎ মুনিয়াকে নিয়ে নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে যায় | যাবার আগে শমিতা আশুবাবুকে কাছে ডেকে আদর করে বলে - আশুবাবু তুমি বড় হয়ে আমাদের কাছে বেড়াতে আসবে তো? আশুবাবু শমিতার হাত কাঁধের থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে, আমার মা জানে | তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় সে আর ফিরে তাকায়নি শমিতার দিকে |

এরপর অনেক বছর কেটে গেছে | প্রথমদিকে বেশ ঘনঘন যোগাযোগ থাকলেও ব্যস্ততা ও দূরত্বের কারণে স্বাভাবিকভাবেই সে যোগাযোগ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে গেছে |

বহুদিন পরের কথা, Empty nester হওয়ার কারণে শমিতা ও জিতের হাতে এখন সময় অনেক | নিউ ইয়র্কে বেড়াতে গিয়ে এমনিই এক সন্ধ্যায় শমিতার হঠাৎ মনে হ'ল, আশুবাবুর খোঁজ নেওয়া যাক | পুরনো ফোন নম্বরে ফোন করতে একটি নতুন নম্বর পাওয়া গেল | সে নম্বরে পাওয়া গেল আশুবাবুর মাকে | তিনি শমিতার গলা শুনে খুবই খুশি | কিছু খবরের আদান প্রদান হ'ল | আশুবাবুর দিদির বিয়ে হয়ে সে এখন

দুটি বাচ্চার মা ও একটি কম্পানির দায়িত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত | আশুবাবুর একটি ছোট ভাই, যার খবর শমিতা জানত না, একটি ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর|

আর আমার আশুবাবু, তাঁর খবর কী? - উদগ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করল শমিতা|

ওদিকের নীরবতা ছাপিয়ে ভেসে এল একটি দীর্ঘশ্বাস|

ভাবী, কেমন আছে আশু? কিছু বলছ না কেন? শমিতার বুকের মধ্যে কেমন যেন এক ভয়ের ঢেউ উছলে উঠল|

ভাবী বললেন - সে যে অনেক কথা ভাই, কোথা থেকে শুরু করব, কী বলব বুঝতে পারছি না | তবে আমাদের আশু আর নেই!

শমিতার মনে হ'ল, সে ঠিক শুনছে না | কোথায় গেছে আশু, তার সেই গোপাল ঠাকুরের মতো ছোট্ট গোলগাল আশুবাবু? তার উদভ্রান্ত মন যেন উত্তর খুঁজতে লাগল নিজের কাছেই|

তারপর সে শুনতে পেল, ভাবীর কান্নাভরা গলা | ভাবী বললেন - জানো শমিতা, তোমরা চলে যাবার পর ছেলেটা যত বড় হতে লাগল ততই কেমন যেন নিজের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগল| কোনও বন্ধুবান্ধব নেই, খেলাধুলোয় উৎসাহ নেই, কেবল ছবি আঁকত দিনরাত | নিজের ছোটবেলার ছবি, আমাদের সেই পুরনো বাড়িটার ছবি, এইসব | স্কুল শেষ করে চলে গেল শিকাগোতে, বলে গেল আর্ট শিখবে | সেখানে গিয়ে আমাদের সবার সঙ্গে যোগাযোগ কেটে দিল | কী করে তার চলত, কোথায় থাকত কিছুই জানতে পারতাম না | মাঝে মাঝে আমাকে অনেক দিন পর ফোন করত, কিন্তু তারপর আবার চুপ | এমনই চলছিল, কে জানে কতদিন! হঠাৎ একদিন পুলিশের ফোন - জানতে পারলাম আশু শিকাগোর এক হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে, drug overdose! সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম, কিন্তু আশুকে আর পেলাম না | সে ততক্ষণে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছে | ভাবী যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন, ছেলেটা কোন অভিমানে এমন করে চলে গেল?

শমিতার মনে ভাবীর ওই শেষ কথাটি কেবলই অনুরণিত হতে লাগল - 'ছেলেটা কোন অভিমানে এমন করে চলে গেল?' কোন অভিমানে, কার ওপর অভিমানে সবকিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল আশু? কেন সে চুপ করে চলে গেল? মানুষের মন এক আশ্চর্য বস্তু! কখন, কোথায়, কোনখানে যে কী রকম আঘাত লাগে, কে জানে! আর সে আঘাত তাকে কোন বিপথে চালনা করে, তাই বা কে বলতে পারে?

শমিতা মনে মনে ভাবে ছোট্ট আশুর কাছে সেই কি দোষী? তার কচি মনে শমিতাকে নিয়ে যে স্বপ্ন আশু দেখেছিল, পৃথিবীর কাছে তা যতই অবান্তর মনে হোক না কেন আশুর কাছে সেই ছিল চরম সত্য | তার সবচেয়ে ভরসার আধার তাকে সবচেয়ে বেশি আঘাত দিয়েছিল | যে জায়গায় সে প্রতিষ্ঠিত ছিল সেখানে এনে বসিয়েছিল অন্যদের, বুঝিয়েছিল, এইটাই নিয়ম! কার নিয়ম, কে করেছে এই নিয়ম এ কথা সে বোঝায়নি | আশুবাবুর অসহায় ছোট্ট মন প্রতিবাদ করতে চাইলেও কোথায় যেত সে? কার কাছে নালিশ করত? যে কথা সে কারো কাছে বলতে পারেনি, তার সেই নিরুচ্চারিত কথাকে ব্যক্ত করতে চেয়েছিল মূক কাগজের বুকে রং ও তুলির মাধ্যমে | সে বুঝি সেখানেও পায়নি তার সান্ত্বনা | তাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল সুচিত্রিত রঙিন জীবনের ছবির দিক থেকে | ঝাঁপিয়ে পড়েছিল গভীর কালো অজানা অন্ধকার গহ্বরের কোলে, সবাইকে পিছনে ফেলে রেখে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে|

শমিতা জানে এখানে দোষত্রুটি নিয়ে বিচার করতে বসলে তাকে কেউই দোষ দেবে না | কিন্তু সে কি আরো কিছু করতে পারত না, যাতে তার আশুবাবুর অভিমান বদলে যেত সুন্দর স্মৃতিতে? হয়তো - কিন্তু এখন যে বড্ড দেরি হয়ে গেছে!

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

পরিকল্পনা

হুসনে জাহান

সরস্বতীর বরে, লক্ষ্মী যায় সরে
সরস্বতীর আঙিনায় লক্ষ্মী না পায় ঠাঁই
সরস্বতী যার দুয়োরে, লক্ষ্মী না চায় ফিরে|

এক বিদ্বান পন্ডিতের ঘরে এক হীরের টুকরো ছেলের জন্ম | সরস্বতী প্রসন্ন হয়ে আশীর্বাদের ঝুলি উজাড় করে বর দিলেন| সেই বরে দেবীর রঙিন পাখায় ভর দিয়ে পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিদেশী শিক্ষার আকাশে ডানা মেলে সে উড়ে চলে ধূমকেতুর বেগে | আর তার সাথে পারিবারিক শিক্ষার নীতি, সততা, মানবপ্রীতি ও পরোপকারের ইচ্ছা গেঁথে রইল তার ধমনীতে | কৃতিত্বের সাথে পড়াশেষে চাকরি হ'ল কলেজের প্রভাসকের | রাজজুটি মিলল পাল্টি ঘরের সুন্দরী বুদ্ধিমতী লীনার সাথে | সরস্বতীর বেদিতে লক্ষ্মীদেবীর কৃপা যে দুর্লভ হতে পারে সে ধারণা ছিল না পূজারীর | লক্ষ্মীর কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করতে যে অন্য কলা-কৌশলের প্রয়োজন, সে জ্ঞান না থাকলে লক্ষ্মীদেবী তো অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বাহনসহ চৌকাঠের শত সহস্র মাইল দূর থেকেই ফিরে যাবে| ফলে সারা জীবন মরীচিকার পেছনে ছুটে সর্বস্বান্তের কোঠায় নাম লেখালেও দেবীর প্রসন্ন দৃষ্টি ফিরে পাবার আশা অতি ক্ষীণ|

অধিকাংশ মেধাবী ছাত্রদের ধারণা যে যদু, মধু সবাই যদি ব্যবসা করে লাল হতে পারে, তাহলে আমি কেন ক্লাসের উত্তম ছাত্র হয়ে শুধু কোনোমতে ঘষেমেজেই জীবন কাটাব? বিবেক ও সহানুভূতি সম্পন্ন মানুষের মন পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিকতার অসামঞ্জস্যতার তুলনামূলক সচেতনতায় কষ্ট পায় | সাধারণ ও নিম্ন মেধাবী মানুষের প্রাচুর্য দেখে ক্ষোভের সৃষ্টি হওয়াও স্বাভাবিক | মোট কথা, সবার মনেই কিছুটা বিত্তবান হবার শখ তো জাগতেই পারে | তাছাড়া উচ্চ জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ অল্প বিদ্যার লোকের কাছে মাথা নত করতেও তো সংকুচিত হয়!

আসল কথা অসীম চারিদিক দেখেশুনে উপলব্ধি করেছে যে ব্যবসায়ীরা সাধারণত অসৎ উপায়ে নিম্নমানের স্বল্পদামী মাল ব্যবহার করে বেশি লাভ করে মানুষ ঠকাবার চেষ্টাই করে চলে| তার বিশ্বাস অসৎ উপায় পরিত্যাগ করেও দেশের ও দশের উপকারের জন্য ব্যবসা করা সম্ভব | সেটাই সে প্রমাণ করতে ব্যগ্র | তার স্ত্রী, লীনার অসীমের বিচার-বুদ্ধি, চিন্তাধারা ও সৎ সংকল্পের ওপর ছিল গভীর আস্থা | তাই অসীমের ব্যবসার পরিকল্পনা এবং সদিচ্ছার কথা শুনে স্বামীকে সে শতভাগ সমর্থন জানাল | স্বামীর মুখে সব বিস্তারিত শুনে লীনা বুঝেছিল যে স্কুল ও পাঠশালার নিম্নশ্রেণীর ছাত্ররা লেখার জন্য যে স্লেট ব্যবহার করে সেগুলো সব নিকৃষ্ট মালমশলা দিয়ে নিম্নমানে তৈরী | যার কারণে সেগুলো দেখতেও যেমন ঘোলাটে তার ওপর লেখাও তেমনই অপরিষ্কার | কাজেই তার স্বামী নির্ভেজাল মাল ব্যবহার করে গুণে, মানে এক নম্বর স্লেট তৈরী করে দিলে স্কুলের ছাত্র এবং কর্তৃপক্ষ উভয়েরই অনেক উপকার হবে | আর যেহেতু স্লেট ছোট শহর আর গ্রামাঞ্চলের সব স্কুলে সার্বজনীন এক প্রয়োজনীয় সামগ্রী, তার চাহিদা ও বিক্রির ব্যাপারে কোনো সমস্যাই হতে পারে না | বানান ভুল, যোগ বিয়োগের ভুল, বাক্যের ভুল, অঙ্কন ভুল সবই ডাস্টার কিংবা ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছে দিলেই পরিষ্কার! নতুন করে সবই আবার অতি সহজেই লিখে ফেলা যায়|

অসীমের বাক্য-স্রোতের বান প্রথমে শুরু করল পাড়াপড়শির মগজ ধোলাই | বিষয়বস্তু জলের মতো পরিষ্কার করে বোঝাতে তার জুড়ি মেলা ভার| ক্লাসে ছাত্রদের সে নিজের সন্তানের মতো যত্ন ও স্নেহভরে গোড়া থেকে সব এমন সুন্দর করে বোঝাত যে সব ছাত্রদেরই সে ছিল প্রিয় শিক্ষক | কাজেই তার ব্যবসার অখণ্ডনীয় পরিকল্পনার যৌক্তিকতা সম্পর্কে কারুরই একবিন্দু দ্বিধা বা অবিশ্বাসের অবকাশ থাকেনি | সবাই তার সাথে কাজ করতে আগ্রহী হয়েছে|

অসীমের এক পিসীর ছেলে তাদের কাছে থেকে হাইস্কুলে পড়ত | আর পাশের দাওয়ায় বসে হুঁকো টেনে জমিজমা, বসতবাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ এবং সবার ওপর হম্বিতম্বি করত যে মামা, তারাই হ'ল অসীমের ব্যবসার প্রথম শিকার | মামার আড়তের এক কোণে স্বল্প পরিসর এক পরিত্যক্ত স্থান পরিষ্কার করা হ'ল স্লেট তৈরীর জন্য | শহরের সর্বোত্তম কারিগর খুঁজে শুরু হ'ল তাদের আদর্শ ব্যবসার তোড়জোড়|

লীনার ওপর দায়িত্ব পড়ল কারখানার নামকরণ এবং বিক্রয়ের রশিদের প্যাড ডিজাইন করা| ভবিষ্যতে লিনা ও অসীমের পুত্র সন্তান জন্ম নিলে যে নামে তাকে ডাকা হবে, সেটাই তাদের নতুন পরিকল্পনার নামকরণ করা হ'ল | কারখানার খাতার মাথায় ছাপা হ'ল "মাসুম ইন্ডাস্ট্রিজ"|

প্রতিদিন কলেজ থেকে ফিরেই অসীম ছুটত তার কারখানায়, আর প্রত্যাবর্তন রাত ন'টার পর। যতই হুড়োহুড়ি করে, উৎসাহ নিয়ে স্লেট তৈরির কাজ চলুক না কেন, অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদের ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মধ্যে দিয়ে গিয়ে কাজ সম্পন্ন করতে হিসাবের চাইতে একটু বেশীই সময় লেগে গেল। এদিকে পাঠশালা আর স্কুলের নতুন বছর শুরু হতে চলল, সে কথা তারা খেয়াল করতে পারল না। মাস ছয়েক এভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলবার পর এক সন্ধ্যায় অসীম ঝকঝকে মজবুত এক স্লেট এনে লীনার হাতে দিল। লীনা একগাল হেসে বলল, "আহা, কী সুন্দর স্লেট। ছাত্ররা দেখে কী যে খুশি হবে! তোমাদের এতদিনের পরিশ্রম সত্যিই সার্থক হয়েছে। খুব ভাল স্লেট হয়েছে।"

অসীমের লোকজন স্লেট বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে গেল। দোকানীরা স্লেটগুলো অতি উত্তম মানের মেনে নিল, কিন্তু কেনবার জন্য হাত বাড়াল না। সে সবের যা দাম ছিল কেউ সে দাম দিতে রাজী হ'ল না। এদের অনুরোধে দু'একজন দোকানদার গ্রাহককে দেখাবার জন্য নমুনা রাখতে সম্মত হ'ল। মাসখানেক এভাবে ঘোরাঘুরির পর হতাশ হয়ে তাদের বিফলতার কারণ চিন্তা করে বোঝা গেল যে স্কুল শুরু হবার আগেই সবার কেনাকাটা শেষ হয়ে যাওয়াতে স্লেট বিক্রির সময়টাও শেষ হয়ে যায়। তারপর চলতি স্লেটের চাইতে বেশী দাম ধার্য করায় বিক্রি করা সম্ভব হ'ল না। শেষ কথা হ'ল, চালু স্লেটের নির্মাতারা এবং বিক্রেতারা কি সহজে অন্য স্লেটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের ব্যবসা বন্ধ করতে কখনো রাজী হতে পারে!

এই বিফলতায় অসীম কিছুদিন বিষণ্ন হয়ে কাটালো। পরাজয় এবং অপারগতা মেনে নেওয়া খুব কঠিন। কয়েক মাস পরেই মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে আবার লক্ষ্মীর অন্বেষণে নতুন ব্যবসার সম্ভাবনায় মশগুল হয়ে গেল। বইপত্র ঘেঁটে, অভিজ্ঞ লোকের পরামর্শ নিয়ে সে আবার নতুন উদ্যোগে অন্য এক ব্যবসার সম্ভাবনার কথা ভাবতে লাগল।

দেশে সিগারেটের মতো পানও এক নেশা। সেই পানের ভেতর সুপারি, চুন এবং ঠোঁট লাল করবার জন্য দেওয়া হয় খয়ের। খয়ের যে এক রকম গাছের আঠার মতোই রঙিন রস সে তথ্য বুদ্ধিমান স্বামীর কাছেই লীনা জানতে পারল। অসীম বোঝাল যে দেশের হাজার মানুষ প্রতিদিন পানের সাথে যে খয়ের চিবিয়ে খাচ্ছে তা মোটেই পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তৈরী নির্ভেজাল নয়। ব্যবসায়ীরা কম খরচে বেশী লাভের উদ্দেশ্যে ভেজাল মিশিয়ে সবার স্বাস্থ্যহানি করছে - সে কথা কেউ বোঝে না এবং পরোয়াও করে না। সেই খয়ের বিশুদ্ধ মাল দিয়ে পরিষ্কার পরিবেশে যত্ন সহকারে তৈরী করে দিলে দেশের ও দশের অনেক উপকার হবে। অসীমের চিন্তা ও যুক্তি সম্পর্কে লীনার কখনোই সন্দেহ ছিল না। একবার বিফল হয়েছে বলে কি বারবারই তা হবে? পুরনো আত্মীয়দেরই আবার ডেকে আনা হ'ল। তারপর বিশ্বস্ত ও উন্নত কারিগর ডেকে পুরোদমে শুরু হ'ল অসীমের উন্নত মানের খয়ের তৈরীর প্রজেক্ট।

মাস দুয়েক পরেই সর্বোত্তম খয়ের তৈরী হয়ে গেল। তার রঙ ও স্বাদের তুলনাই হয় না। কিন্তু সেটা বাজারে চালু করতে গিয়ে আবার সেই স্লেটের মতোই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হ'ল - তৈরীর খরচ বাজারের চলতি খয়েরের দামের চাইতে বেশী হওয়াতে বিক্রি করা সম্ভব হ'ল না। মালের গুণাগুণের চাইতে পকেটে পয়সার থলিটার প্রতিই তো নির্বোধ ক্রেতার বেশী মনোযোগ!

ওদিকে ক্রমাগত স্লেট ও খয়ের তৈরীর কাজে মনোযোগী হবার সুযোগে অসীমের এক পুরনো প্রতিযোগী যে তার অজান্তে বিভাগীয় দায়িত্বভার হস্তগত করে ফেলল - তা সে মোটে আন্দাজও করতে পারল না।

দুবার লক্ষ্মী বিমুখ হবার পর অসীমের ব্যবসায়ী চিন্তা কিছুদিন ধামা চাপা পড়ল। লীনা অসীমের দুর্ভাগ্যে ও ব্যবসার ব্যর্থতায় দুঃখিত হলেও ব্যবসা প্রতিষ্ঠা করবার চাপ ও অনিশ্চয়তা থেকে রেহাই পেয়ে কিছুটা হাঁপ ছাড়ল। সবার ভাগ্যেই কি ধনী হবার সুযোগ হয়! বিশেষ করে সততা ও নীতিবান লোক কি লোভী, ধূর্ত ও বিবেকহীন মানুষের মতো হতে পারে? এর কিছুদিন পর বিদেশে ট্রেনিং-এ যাবার সুযোগ হলে অসীম কয়েক বছরের জন্য বিদেশে পাড়ি দিল। ট্রেনিং শেষে ফিরে এসে শিক্ষা বিভাগ ছেড়ে সচিবালয়ে ভাল পদে নিযুক্ত হ'ল।

অন্যের নির্বুদ্ধিতা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাবার এবং শুধরে দেবার প্রবণতা অসীমের চরিত্রের এক দুর্বলতা ছিল। নতুন অফিসে কীভাবে কাজ করা উচিত এবং দেশের ও দশের কিসে মঙ্গল তা সে সুযোগ পেলেই সবাইকে বোঝাতে বসে যেত। দেশের সরকার, রাজনীতিবিদ ও বড় ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থান্বেষে দেশের সম্পদ ব্যবহার না করে বিদেশ থেকে ১০ গুণ বাড়তি দামে প্রয়োজনয়ীও সামগ্রী আমদানি করে, দেশে

উৎপাদন করে কীভাবে তার প্রতিকার করা যায় এই ছিল তার মূল মন্ত্র | রেডিও, টিভি, জীবনযাত্রার নিত্য প্রয়োজনীয় ছোট ছোট জিনিস থেকে শুরু করে রাডার, এরোপ্লেনের ছোট ছোট অংশ সবই যে দেশে তৈরী করা সম্ভব তা সবাইকে বোঝাবার জন্য সর্বদা সুযোগের অপেক্ষায় থাকত | কিন্তু লক্ষ্মী বিমুখ! তার মতো জ্ঞানী মানুষের অখণ্ডনীয় পরামর্শ শুনেও কেউ সহজে অর্থের ঝুঁকি নিতে রাজী হচ্ছিল না | তার চিন্তা ভাবনা এমন ভুতের মত চেপে বসেছিল যে বিদেশে অর্জিত সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রেখেছিল, তা লীনাকে না জানিয়েই নিঃশব্দে স্বপ্ন পূরণের কাজে ব্যয় করতে শুরু করল |

এবার অসীমের উদ্দীপনার প্রথম শিকার হ'ল লীনার মায়ের দেওয়া তাদের এক গ্রাম্য কাজের ছেলে | অসীম অন্যান্য সবার মতো তাকেও নিয়মিত লেখাপড়া শেখাত | আর তাকে বোঝাতে শুরু করল যে মানুষের বাসায় কাজ করে জীবনে উন্নতির কোনো সম্ভাবনা নেই | তাই তাকে কয়েক হাজার নগদ টাকা ধার দিয়ে গ্রামে ফিরে মরিচ, রসুন চাষ করে রোজগার করবার পরামর্শ দিল | ফসল প্রাপ্তির পর বিক্রি করে লাভের অংশ থেকে অসীমের ধার কিস্তিতে শোধ করলেই চলবে | সে ছেলে এত টাকা একসাথে পেয়ে প্রথমেই ভবিষ্যতে ব্যবসায়ী হবার প্রস্তুতির জন্য সাহেবী পোশাক-আশাক মোজা জুতো কিনে ভোল বদলাবার পদক্ষেপ নিল | তারপর অসীমের সাথে সর্বক্ষণ আলাপ আলোচনার প্রয়োজনে তার শোবার স্থান ধোপদুরস্ত লেপ তোষক বিছানা বালিশ কিনে কাজের লোকের কোয়ার্টার থেকে অসীমের স্টাডিতে স্থানান্তরিত হ'ল | এরপর একদিন পরিবারের অসুস্থতার দোহাই দেখিয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সে গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল | সে ছেলের যদি গ্রামে চাষ করে কাদামাটি মাখবার আগ্রহ থাকত, তাহলে কি আর সে শহরের কাজে এসেছিল? পয়সার অভাবে শহরের আশ্রয় নিয়েছিল, আর সে পয়সা হাতে পেয়ে পরিবারের সাথে ফুর্তি করেছে! জমিতে কোন ফসলের চাষ সে করল, তা তো কেউ পরখ করতে যায়নি | মোট কথা সে যখন আর শহরে ফিরল না, তখন অসীমের দেওয়া টাকা দাতব্য কাজেই লেগে গেছে মনে করতে হ'ল | আর তার সাথে অসীমের সেই পরিকল্পনাকারও সমাধি হ'ল |

অসীমের বিফলতা বেশিদিন তাকে দমিয়ে রাখতে পারে না | কিছুদিন পরই তার বুদ্ধির কবলে পড়ল খৌরকর্ম করবার নাপিত এবং বাড়ির সামনে এক মুদির দোকানদার | নাপিতের দেশের বাড়ি বগুড়ায় | বগুড়ার দই ও ঘি বহুজনের কাছে প্রিয় | নাপিতের হাতে অসীম বগুড়া থেকে প্রতি সপ্তাহে ঘি ও দই এনে ঢাকার দোকানে আধাআধি লাভে বিক্রির পরামর্শ দিয়ে অগ্রিম টাকা হস্তান্তর করল | নাপিতের চালু ব্যবসা ছেড়ে নতুন ব্যবসা করবার আগ্রহ বা সময় কি তার ছিল? বার দুয়েক অসীমের কথামতো দই এবং ঘি এনে বিক্রি করতে অপারগ হয়ে টাকা গচ্চা দিয়ে ব্যবসার হ'ল ইতি |

আর মুদির দোকানদার! সে তো এক ধুরন্ধর ঝানু ব্যবসায়ী | অসীমের চাপে উত্তরবঙ্গের রাঙা আটা, ছোট আলু ও সরু চাল ঢাকায় এনে বিক্রি করবার পরামর্শে অগ্রিম টাকা গ্রহণ করার পর এমন উগ্রমূর্তি ধারণ করে রূঢ় ব্যবহারের আশ্রয় নিল, যে তার দোকানে কেনাকাটার ওপরেই লেগে গেল অনির্দিষ্ট কালের কারফিউ |

কিন্তু এত বিফলতার পরেও অসীম আবার এক বয়স্ক অটোরিক্সাওয়ালার কাছে তার নিত্যদিনের দুঃখের কথা শুনে নিয়মিত ভাড়ার অতিরিক্ত কবুল করেই দৈনিক যাতায়াতের জন্য নিযুক্ত করল | দুজনের বেশ হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে উঠল | এক সাপ্তাহিক ছুটির আগের সন্ধ্যায় হঠাৎ একদিন অসীম অফিস থেকে বাসায় ফিরল না | ইদানীং নিজের কাজকর্ম ও ঘোরাফেরা সম্পর্কে লীনার সামনে অসীম মুখে একদম তালাচাবি লাগিয়ে রাখত | অসীম রাতে না ফেরায় লীনা অসীমের এক আত্মীয়ের কাছে ফোন করে জানতে পারল যে সে রিক্সাওয়ালার সাথে চাঁদপুর যাবার জন্য নাকি তাকেও যোগ দিতে বলেছিল | নদীর ঘাটে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে অসীমদের না দেখে সে ফিরে এসেছে৷ তারা সম্ভবতঃ স্টিমারে চড়ে চাঁদপুর রওনা হয়ে গেছে | চাঁদপুর! কিচ্ছু বলা কওয়া নেই... আশ্চর্য! বেশ দুঃখিত হ'ল লীনা |

পরদিন দুপুরে বিল্ডিং-এর গার্ড লীনাকে ফোন করে জানাল রিক্সাচালক মাছ নিয়ে এসেছে | রিক্সাচালক জানাল যে তারা চাঁদপুর থেকে ইলিশ মাছ কিনে ভোরে সদরঘাটে মাছের বাজারে বিক্রি করেছে | ঘাট থেকে সোজা অফিসে পৌঁছে অসীম বাসার জন্য দুটো মাছ পাঠিয়ে দিয়েছে | কীরকম বিক্রি হয়েছে জানতে চাইলে রিক্সাচালক এক হাসি দিল, "আরে, সব লোকসান করেই বেচতে হয়েছে |" ইতিমধ্যে কাজের মহিলা গিয়ে দুটো ৮ ইঞ্চি লম্বা ইলিশের পোনা নিয়ে এল, যে মাছগুলো ধরবার ওপর ক্রমাগত সরকারের নিষেধাজ্ঞা প্রচার হয় | তবে সদ্য ধরা তাজা ওষুধমুক্ত মাছ খেতে বেশ স্বাদের ছিল!

অসীমের আর একটি ছোট্ট প্রকল্পের কথা লিখেই আজ শেষ করব | রোজার মাসে সারা শহরে বিভিন্ন জায়গায় দোকানে, ফুটপাথে, রাস্তার ধারে ছোট ছোট টেবিল বসিয়ে ঘুগনি, মুড়ি, নারকেল, পেঁয়াজি, সিঙ্গাড়া, জিলিপি, খেজুর এমনকি বান-রুটি ইত্যাদি সাজিয়ে বসে যায় বিক্রেতারা | বাসার কাজের মেয়েদের সারাদিন পাগলের মতো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিভিন্ন বাসায় কাজ করেও পারিবারিক চাহিদা মেটাতে না পারার দুঃখ শুনে লীনা তাদের বলত "তোমরা রোজার মাসে পথের ধারে বসে মুড়ি, পেঁয়াজি তৈরী করে সন্ধ্যেবেলা বিক্রি করে তো বেশ উপার্জন করতে পারো |" কথা প্রসঙ্গে এ কথা একদিন অসীমের কাছেও সে উল্লেখ করেছিল |

পরবর্তী রোজার সপ্তাহ দুই আগে দেখা গেল অসীম অফিস থেকে ফিরেই রিক্সাচালকের রিক্সা বাসার সামনে পার্ক করে রেখে অটো রিক্সায় অভিজাত এলাকায় যাতায়াত করছে | রোজার প্রথম দিন অফিস থেকে দুপুরের পর বেরিয়ে সে বলল রিক্সাচালকের সাথে অভিজাত এলাকায় যাচ্ছে | ঘন্টা চারেক পর সে ফিরে এল | জিজ্ঞেস করলে বলল, "ইফতার খেয়ে এলাম |" ভাল কথা | বন্ধুবান্ধবের সাথে ইফতার (রমজানের মাসে সূর্যাস্তের পর দিনের একমাত্র আহার) খাওয়া আনন্দের বিষয় | কয়েকদিন এই নিয়মই চলল | কী ব্যাপার, রোজই কি বাইরে ইফতার খাবার শখ! ক্লান্ত হয়ে ফিরে ঘরে ঢুকে সোজা বিছানায় | সকালে উঠে অফিস - আর সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি | এভাবে দিন পনেরো গেল, হঠাৎ একদিন দেখা গেল ইফতারের দাওয়াত শেষ | অফিস শেষে বাবু বাসায় ফেরৎ | সুযোগমতো রিক্সাচালকের কাছ থেকে লীনা জানতে পারে যে অভিজাত এলাকায় পান বিক্রেতার এক ছোট বাক্স দোকান ভাড়া নিয়ে ইফতার কিনে তারা বিক্রি করত | "তারপর কী হ'ল? কীরকম বিক্রি হত?"

"আরে, কিসের বিক্রি খালাম্মা? শেষে আমরাই বইস্যা ইফতারগুলা খাইতাম, আর বস্তির পোলাপানগো ডাইক্যা খাওয়াইয়া দিতাম | কিচ্ছুই লাভ হয় নাই | হুদাই খাটনি আর হয়রানি |"

লীনা অনুমান করল যে তাদের এলাকা থেকে ৫ মাইল দূরে অভিজাত এলাকায় অটোরিক্সাতে যাওয়া আসা, রিক্সাচালককে অর্ধেক দিনের পারিশ্রমিক দেওয়া, দোকানের ভাড়া, ইফতারের সামগ্রী ও পানীয় কেনা ইত্যাদি মিলিয়ে যে খরচ করতে হয়েছে, বিক্রি করে সে সব খরচ সামলানোর পর তো ব্যবসার লাভ বিচার করা হবে! আর অভিজাত এলাকার অভিজাত বাসিন্দারা বাসায় ইফতার তৈরী না করলে ভাল দামী রেস্ট্যুরেন্টে না গিয়ে কি রাস্তার বাক্স-দোকান থেকে ইফতার কিনবে নাকি! নিম্ন ও মধ্যবিত্ত পাড়া হলে ইফতারের সব খাবারই সূর্য ডোবার আগেই পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যেত | হায় রে, পড়ুয়া বৈজ্ঞানিকের বাস্তবিক বুদ্ধির বহর দেখে লক্ষ্মীদেবী আবার মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন!

কিন্তু এতবার নিরাশ হবার পরও ব্যবসার ভূত অসীমের কাঁধ থেকে নামেনি | নতুন কিছু কল্পনা মাথা চাড়া দিলেই তা বাস্তাবায়ন করবার জন্য নতুন মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করে দিত | সে যে এক পরোপকারী বড় বৈজ্ঞানিক! একবার পৈতৃক সম্পত্তি হাতে এলে লীনা সেসব ব্যাংকে রাখার মতলব দিয়েছিল | সেই প্রস্তাব শুনে সে স্ত্রীকে বলল, "তুমি এসব বুঝবে না, আমি জানি কীভাবে টাকা খাটাতে হয় |" বার দুয়েক বড় ধরনের প্রজেক্ট কার্যকরী করবার জন্য কিছু ধনী বন্ধু স্থানীয়দের ভাগিদার করবার প্রচেষ্টা আন্দাজ করতে পেরে পারিবারিক সুনাম ও সম্পর্ক রক্ষার্থে লীনা গোপনে তাদের কাছে গিয়ে অসীমের ব্যবসার অনভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে সতর্কতার হুঁশিয়ারি দিয়ে এসেছে - "সে আদর্শবাদী ব্যবসায়ী, সৎ এবং বুদ্ধিমানও বটে, তবে আজ পর্যন্ত তার কোনও প্রজেক্ট সফল হয়নি |"

পরোপকারে আগ্রহী অনভিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক এভাবেই বাকী জীবন কাটিয়ে, সর্বস্বান্ত হয়ে, চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করে | তার কিছুদিন পরই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সে পরলোক গমন করে | একদিন তার কাগজপত্র গোছাতে গিয়ে লীনা তার এক ডায়েরি খুলে দেখে বেশ কিছু লোকের নামের একটি তালিকা | নামগুলোর পাশে লেখা কাকে কত টাকা ধার দেওয়া হয়েছে, যা তার দেহান্তের পর লীনার কাছে শোধ করবার জন্য স্বাক্ষরিত চুক্তি | অসীমের জীবদ্দশায় যারা ধার শোধ দেয়নি, তারা কি লীনার কাছে টাকা ফেরৎ দেবার জন্য এগিয়ে আসবে!

একটি মামুলি ঘটনা

পুষ্পা সাক্সেনা (অনুবাদ: সুজয় দত্ত)

গাড়ীটা বড়রাস্তা ছেড়ে বাঁদিকে বাঁক নিতেই সন্ধ্যার মনে হয়েছিল সামনের গলির মুখটায় মোটরবাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেগুলো নিজেদের মধ্যে চোখে চোখে কী যেন ইশারা করছে | ওদের মধ্যে একজন 'অল ক্লিয়ার'-এর' সংকেত দেওয়ার জন্যই সম্ভবত হাতের দু-আঙুল গোল করে দেখাল অন্যদের | গাড়ীর পিছনে পিছনে মোটরবাইকটাকে ধাওয়া করে আসতে দেখে অজানা আশংকায় বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল সন্ধ্যার | একটু পরেই অবশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা | ওই মোটরবাইকের আরোহীরা সত্যিই ওদের পিছু নিয়েছে | মৃদুস্বরে চালকের আসনে বসা স্বামীকে বললেন, "দেখেছ, একটা বাইক আমাদের ফলো করছে?"

"আরে দূর, তুমি মিছিমিছি সন্দেহ করছ | এই রাস্তা দিয়ে এই সময়ে আমরা ছাড়া আর কেউ যেতে পারে না বুঝি?" রবীন্দ্র আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করেন | কিন্তু পিছনে দেখার আয়নাতে বাইকটার গতিপ্রকৃতি দেখে উনিও ভেতরে ভেতরে একটু চিন্তিত হলেন | স্ত্রীকে নির্দেশ দিলেন, "তুমি তোমার গয়নাগুলো চটপট খুলে পার্সে রাখো তো |" আর পিছনের সীটে বসা মেয়েকে বললেন, "পূজা মা, তুই সীটের ওপর শুয়ে পড় তো, যাতে তোর মাথাটা দেখা না যায় |" কথাটা শুনেই সন্ধ্যার হৃদস্পন্দন দ্বিগুণ হয়ে গেল | কাঁপা কাঁপা হাতে গলার হার আর হাতের চুড়িগুলো খুলে হাতব্যাগে রাখলেন | অস্ফুট স্বরে "হে ভগবান, রক্ষা করো" বলে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে একবার তাকালেন পিছনের সীটে নিশ্চিন্তে বসে থাকা মেয়ের দিকে |

আজকাল প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে এই ছোট শহরে বেশ কয়েক ঘন্টার জন্য বিদ্যুৎ চলে যায় | রাতের অন্ধকারে রাস্তাঘাটে এমনিতেই ভয় লাগে, তার ওপর আজ এই পিছু-নেওয়া ছেলেগুলোর মতলব কী সেটা বোঝা যাচ্ছে না | রবীন্দ্র গাড়ীর গতি বাড়ালেন | সঙ্গে সঙ্গে পিছনের মোটরসাইকেলও তাই করল | কোনোরকমে নিজেদের বাড়ীর গলিতে ঢুকে সন্ধ্যা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন | রবীন্দ্র আশ্বস্ত গলায় বললেন, "যাক, ফাঁড়া কাটল মনে হচ্ছে |"

ওঁদের ফ্ল্যাটের গ্যারেজ ঠিক ফ্ল্যাটের নীচে নয় | গলি থেকে বেরিয়ে একটু দূরে রাস্তার ধারে | অন্যদিন পূজা বাবার সঙ্গে গ্যারেজ অবধি গিয়ে দরজাটা খুলে ওঁকে গাড়ী ঢোকাতে সাহায্য করে | আজও সেই ভেবেই ও গাড়ীতে বসে রইল | কিন্তু রবীন্দ্রর মনে আজ একটা অজানা অস্বস্তি, তাই মেয়েকে বললেন, "তুই মায়ের সঙ্গে নেমে যা পূজা, আমি গাড়ীটা রেখে এক্ষুনি আসছি |"

"না বাবা, এখন তো বাড়ী এসে গেছি | ভয় পাচ্ছ কেন? চলো, আমিই গ্যারেজ খুলব | মা, তুমি বাড়ী যাও, আমি বাবার সাথে গেলাম |"

গাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি নেমে ফ্ল্যাটের সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগলেন সন্ধ্যা | যেন পিছনে অদৃশ্য কেউ তাড়া করছে | দরজায় পৌঁছে কলিংবেল টিপতেই ছোট মেয়ে দরজা খুলে জিজ্ঞেস করল, "এত দেরী হল কেন মা? কাকু বেনারস থেকে ফিরেছে তো?"

মেয়ের কথা যেন শুনতেই পাননি এইভাবে দ্রুতপায়ে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ালেন সন্ধ্যা | দৃষ্টি বাইরে অন্ধকারের দিকে | মেয়েও মা'র চিন্তিত মুখ দেখে অবাক হয়ে পাশে এসে দাঁড়াল | হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন সন্ধ্যা | গলির মোড়টাতে গ্যারেজের ঠিক সামনে রবীন্দ্রর কানে পিস্তল ঠেকিয়ে ওঁকে গাড়ীর ভেতর ঠেলে ঢোকাচ্ছে এক যুবক | সেই যারা পিছু নিয়েছিল তাদেরই একজন | তার মানে বাড়ীর কাছাকাছি এসে অন্য গলি দিয়ে ওরা গ্যারেজের মুখে আগেই পৌঁছে অপেক্ষা করছিল |

"বাঁচাও! বাঁচাও!" চীৎকার শুনে কয়েকজন পাড়াপড়শি বাইরে বেরিয়ে এলেন | কিন্তু তাঁরা কিছু বুঝে ওঠবার আগেই সেই পিস্তলধারী যুবক রবীন্দ্রকে আরোহীর আসনে ঠেসে ধরে নিজে চালকের আসনে বসে পড়েছে | আর তার সাগরেদ পূজাকে এক ধাক্কায় পিছনের সীটে ফেলে দিয়ে সশব্দে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দিয়েছে | সন্ধ্যার অসহায় চীৎকার এবার কান্নায় পরিণত হ'ল | লোকজন গাড়ীটাকে লক্ষ্য করে ঢিল-পাটকেল পাথর-টাথর ছুঁড়ল খানিক, কিন্তু কিছুই হ'ল না তাতে | পালালো অপহরণকারীরা তাদের শিকারসমেত | গাড়ীর খোলা জানলা দিয়ে পূজার "মা, মা" চীৎকার ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গেল |

প্রতিবেশীরা কেউ কেউ তৎক্ষণাৎ ছুটলেন পুলিশে ফোন করতে | কিন্তু করে কী হবে - অপরপ্রান্তে কেউ সে-ফোন ধরলে তবে তো! বেশ কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর সন্ধ্যাদের ওপরের ফ্ল্যাটের বাসিন্দা রাজেশ তলোয়ার পরামর্শ দিলেন, "চলুন, থানায়

গিয়ে রিপোর্ট লিখিয়ে আসি |" কিন্তু ওই অন্ধকারের মধ্যে মাত্র কয়েক মিনিট আগে ঘটে যাওয়া সশস্ত্র অপহরণের প্রত্যক্ষদর্শীরা কেউ গাড়ী বার করতে সাহস পাচ্ছিলেন না | শেষে রবীন্দ্রর এক সহকর্মী তথা ঘনিষ্ঠ বন্ধু অরবিন্দ স্বরাজ বললেন, "ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি | রিপোর্ট তো করাতেই হবে | কে কে যাবে আমার সঙ্গে?" দু-তিনজন এগিয়ে আসতে উনি চটপট গ্যারেজ থেকে গাড়ী বার করে রওনা দিলেন |

থানার দরজায় একজন উর্দিপরা কনস্টেবল বসে ঢুলছে | অরবিন্দ তাকে দেখে জোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "ইন্সপেক্টর সাহেব কোথায়?" সে তন্দ্রা ভেঙে সোজা হয়ে বসে উত্তরের বদলে পাল্টা প্রশ্ন করল, "আসছেন কোত্থেকে? কী দরকার?"

"আমাদের একটা রিপোর্ট লেখাতে হবে | তাড়াতাড়ি ডাক ওঁকে | জরুরী রিপোর্ট |" অরবিন্দর পড়শী অনিল মাধবাণী প্রায় ধমকের সুরেই বললেন |

"ইন্সপেক্টর সাহেব রেড-এ বেরিয়েছেন | আজ রাতে আর ফিরবেন না |" কনস্টেবলের মুখে বিরক্তি স্পষ্ট |

"আরে বাবা, দু-দুটো জীবনের মামলা এটা | ইন্সপেক্টর যদি না থাকে তার জায়গায় কেউ একজন তো কাজকর্ম দেখছে, না কী? তাকে ডাক |" অধৈর্য হয়ে অরবিন্দ থানার ভেতর ঢুকতে যান |

"দেখুন মশাই, বেশী গলার জোর দেখাবেন না | বলছি না উনি রেড-এ বেরিয়েছেন? সেটা কম জরুরী নয় | ফালতু আরাম করতে যাননি উনি |" কনস্টেবলের গলা এবার বেশ অসন্তুষ্ট |

অরবিন্দ আর তাঁর সহযাত্রীরা অসহায় চোখে তাকালেন পরস্পরের দিকে | অনিল মাধবাণী একটা শেষ চেষ্টা করতে সুর নরম করলেন একটু, "দেখো ভাই, ইন্সপেক্টর কোথায় গেছেন আমাদের বলে দাও, তোমাকে খুশী করে দেব |"

'খুশী করে' দেওয়ার কথা শুনেই চোখ চকচক করে উঠল সেই উর্দিধারীর | "সাহেব তো বলতে মানা করে গেছেন, তাও আপনাদের যখন এত আর্জেন্ট দরকার, বলছি | উনি বাজারে সিডি-ডিভিডির যে বড় দোকানটা আছে, সেখানে ঢুঁ মারতে গেছেন | আজকাল ওই সিডির ব্যবসায়ীগুলো অন্যরকম সব ধান্ধা শুরু করেছে | দুনিয়ার যত বুলু ফিলিমের দুনম্বরী কপি এনে লুকিয়ে বিক্রি করছে আর দেদার পয়সা কামাচ্ছে |"

"বটে! আচ্ছা ভাই, আমাদের এখান থেকে একটা ফোন করতে দেবে? এস পি সাহেবের সঙ্গে একবার কথা বলব |"

"আর বলেন কেন, এই হতচ্ছাড়া ফোনটা তো গত চারদিন ধরে মরে পড়ে রয়েছে |" এবার তার পানখাওয়া দাঁতে হাসি ফুটেছে | খানিক চুপ করে থেকে আবার বলে উঠল, "তাছাড়া আজকের রেড-এ তো ডি এস পি সাহেব, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব - সবাই গেছেন | এস পি সাহেবও ওখানে নেই মনে করেছেন? ওঁকে খুঁজে লাভ নেই | দেখুন গিয়ে, ওঁরা সবাই মিলে হয়তো কোথাও 'নাস্তা-পানি' করছেন এখন |" তার চোখের রহস্যপূর্ণ ইঙ্গিত দেখে শ্রোতাদের বুঝতে বাকী রইল না ঠিক কী বলতে চাইছে | অসহায় আক্রোশে রক্তচাপ বাড়তে লাগল ওঁদের |

"দ্য হেল উইথ দিস কান্ট্রি এন্ড ইটস সিস্টেম!" বলে ক্রোধে কনস্টেবলের পাশের টুলটায় একটা ঘুঁষি মারলেন অরবিন্দ |

"দুটো মানুষের জীবনের চেয়ে পর্ণোগ্রাফির রেড বড় হ'ল?" অরবিন্দর অপর সঙ্গী নীরজনাথ বিড়বিড় করে যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন |

"হ'ল বৈকি | আমজনতার মৃত্যু ওদের কাছে মামুলি ঘটনা | খুনীকে ধরতে পারলে তখন তো পোয়া বারো, তার কাছ থেকে আদায় করা মালকড়িতে ওদের পকেট ভরবে | যার যাওয়ার ছিল সে তো গেছে, তার জন্য আর কান্নাকাটি করে লাভ কী? যে বেঁচে আছে তার থেকেই যতটা পারো লাভ ওঠাও |" বলতে বলতে অনিল মাধবাণী নিরাশ হয়ে বসে পড়লেন গাড়ীর বনেটের ওপর |

"না না, এ কি একটা কথা হ'ল! একটা পুলিশ ফাঁড়ির সমস্ত পুলিশ নাকি গেছে সিডির দোকানে বেআইনি ফিল্ম বাজেয়াপ্ত করতে? আর আমরা যে এখানে সম্পূর্ণ অরক্ষিত হয়ে পড়ে আছি - সেদিকে কারো নজর নেই? আমাদের হাউসিং কলোনীতে যে দিনে-দুপুরে ডাকাতি, রাহাজানি, খুনখারাপি হচ্ছে তার কী হবে?" নীরজ স্বগতোক্তির মতো বলতে থাকেন |

"আচ্ছা, রিপোর্ট লেখবার একটা রেজিস্টার তো আছে? কোনো খাতা-টাতা? সেটাই নিয়ে এসো | আমরা নিজেরাই রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি |" অরবিন্দ নাছোড়বান্দা |

"সে আবার কখনো হয় নাকি?" এবার কনস্টেবলের ঘুম ছুটে গিয়ে সে পুরোপুরি চাঙ্গা, "রিপোর্ট পুলিশের লোক ছাড়া কারুর লেখার নিয়ম নেই | আপনারা আর একটু অপেক্ষা করুন, ইন্সপেক্টর সাহেব আর খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে যাবেন |"

"কী মুশকিল, বুঝতে পারছ না কেন - আমাদের হাউসিং কলোনীর একজন বাসিন্দা আর তার মেয়েকে দুটো লোক গাড়ীতে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে | ওদের জীবন বিপন্ন |"

"আরে না না, আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের মোটরগাড়ীর খুব শখ, অল্পবয়সী মেয়েদের কাছে ইমেজ বাড়াতে হলে গাড়ী থাকা

চাই না? তাই দিনে-দুপুরে গাড়ী ছিনতাই করছে ওরা ইদানীং| চিন্তার কোনো কারণ নেই, আপনাদের বন্ধু আর তার মেয়ের সঙ্গে একটু মৌজ-মস্তি করে ওরা ওদের ছেড়ে দেবে | আমার এরকম বহু ঘটনা দেখা আছে, বুঝলেন?" এমন সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে কনস্টেবলের এই কুৎসিত ইশারা যেন শালীনতার সব সীমা অতিক্রম করে গেল | অরবিন্দ আর রাগ সামলাতে পারলেন না, "এই, চুপ করো তো, একদম উল্টোপাল্টা কথা বলবে না | কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা, আবার ফালতু জ্ঞান দিচ্ছে! ওঃ, আমাদের দেশের পুলিশের কী বিবেচনাশক্তি! কখন কোনটাকে অগ্রাধিকার দিতে হয় ঠিক জানে - এই যেমন এই মুহূর্তে দুটো মানুষের জীবনকে কোনো গুরুত্ব না দিয়ে সিডির দোকানে ব্লু ফিল্ম বাজেয়াপ্ত করে যেন এক রাতে দেশ থেকে সব ভ্রষ্টাচার দূর করে দেবে –"

"ওসব কথায় আর কী হবে অরবিন্দ? আমরা তো একে বলে বলে হদ্দ হয়ে গেলাম | একঘন্টা এখানে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে আছি |" বিধ্বস্ত গলায় বলে উঠলেন নীরজনাথ|

"চলো তো, কমিশনারের বাড়ী যাই," মরিয়া হয়ে ওঠেন অরবিন্দ|

"কমিশনারের বাড়ী গিয়ে হবেটা কী? উনি যদি কোনো নির্দেশ দেনও, তা শোনার লোক এখানে আছে কেউ? অন্য থানায় যে যাব তারও উপায় নেই, সেখানে আমাদের রিপোর্ট নেবেই না | এই জায়গাটা তো আর ওদের এলাকায় পড়ে না | এত রাতে ওরকম দৌড়োদৌড়ি করা কি ঠিক হবে?" মাধবাণী সংশয় প্রকাশ করলেন | ওঁর সংশয় অমূলক ছিল না | কয়েক মাস আগে ওঁর এক বন্ধু সপরিবারে ওঁর বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন ছুটির দিনে | সেই ভদ্রলোকের ছেলে বাড়ীর পাশের মাঠটায় একা একা বল খেলতে গিয়েছিল | অনেক ঘন্টা পরেও সে যখন ফিরে এল না, ছেলেটির বাবা আর উনি গিয়েছিলেন স্থানীয় থানায় রিপোর্ট লেখাতে | মানে এই থানাতেই | এখানকার ডি এস পি তখন মুখের ওপর 'না' বলে দিয়েছিলেন, কারণ সেই ভদ্রলোক এই এলাকার বাসিন্দা নন | বলেছিলেন, "এ কেস লালগঞ্জ থানার, এখানে এসেছেন কেন?" হাজার অনুনয়-বিনয়েও গলানো যায়নি তাঁকে | বারবার অনুরোধ করায় বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, "আচ্ছা, আপনারা কী জানেন না আমরা সরকারী চাকুরে, আইনের বাইরে গিয়ে কিছু করতে পারি না? যান তো, লালগঞ্জ থানায় যান |"

"কিন্তু সুপার সাহেব, ততক্ষণে তো হারানো ছেলেটা না জানি কোথায় পাচার হয়ে যাবে |" ছেলেটির বাবা করুণ গলায় মিনতি করেছিলেন|

"আরে এরই মধ্যে কোথায় পৌঁছে গেছে, সে একমাত্র ভগবান জানেন | এখন আর ফালতু সময় নষ্ট করবেন না, যান, লালগঞ্জ গিয়ে রিপোর্টটা আগে লেখান |" শেষ নির্দেশ দিয়ে ওঁদের বিদায় করে দিয়েছিলেন ডি এস পি | আর তার চারদিন বাদে সেই ফুটফুটে ছেলেটার মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল | আজও যদি শেষ পর্যন্ত ওরকমই - ভাবনাটা মাথায় আসতেই শিউরে ওঠেন মাধবাণী | রবীন্দ্রর কিশোরী মেয়ে পূজার চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে তাঁর|

"চলো, এখানে সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই |" অরবিন্দের গলা শোনা গেল, "আমি আর প্রকাশ ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কাছে যাচ্ছি | মাধবাণী আর নীরজ, তোমরা দুজন - তোমরা দুজন লক্ষ্মণ সিংকে জানাও ব্যাপারটা | দেখো, শেষ অবধি ও-ই হয়তো সাহায্য করতে পারবে আমাদের |"

"সে কী? লক্ষ্মণ সিং তো এক নম্বর গুন্ডা | আপনারা ওর কাছে যাচ্ছেন?" কনস্টেবল যে এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিল সব, তার মন্তব্যে বোঝা গেল|

"এতক্ষণ ধরে তোমার সঙ্গে যা কথাবার্তা হ'ল সিপাইজী, তা থেকে তো এটা পরিষ্কার যে আমরা, মানে আমজনতা, পুলিশের চেয়ে গুণ্ডাদের হাতে বেশী নিরাপদ | কাজেই ও ছাড়া আর গতি কী?" মাধবাণীর গলায় ব্যঙ্গ ঝরে পড়ে|

"ঠিক আছে, যান, ওর কাছেই যান | ও-ই আপনাদের দেখভাল করবে এখন থেকে | ভবিষ্যতে এখানে আর কোনদিন আসবেন না, বুঝেছেন?" কনস্টেবল কাঁধ ঝাঁকিয়ে পকেট থেকে খৈনি বার করে হাতের তালুতে জোরে জোরে ডলতে থাকে|

মাধবাণী আর নীরজনাথ স্কুটারে রওনা হয়ে গেলেন | অরবিন্দ ডিস্ট্রিক্ট কমিশনারের কাছে যাওয়ার আগে একটা সাদা কাগজে সংক্ষেপে খসড়া রিপোর্ট লেখার জন্য একটু থামলেন | ঠিক সেই সময় থানার বাইরের গেটে জীপ্ থামার শব্দে সচকিত হয়ে উঠল কনস্টেবল | খৈনীটা চট করে মুখে পুড়ে হন্তদন্ত হয়ে বাইরে বেরিয়ে এল | জীপ্ থেকে সদ্য নামা লোকজনের কথোপকথন কানে আসছিল থানার ভেতরে বসা অরবিন্দর -

"আরে ইয়ার, আজকের রেড যা উপভোগ করলাম না - কী বলব! ব্যাটা দেশী মালই বার করে দেখাচ্ছিল খালি, হুইস্কির বোতলগুলো সব ভেতরে লুকিয়ে রেখেছিল |"

"তুমি সবকটা হুইস্কির বোতল তুলে এনেছ তো?"

"না তো কী? আরে, দুদিন বাদে আমাদের নগেন্দ্রর ছেলের

জন্মদিন। সেদিনই খুলব ওগুলো। কী হে নগেন্দ্র - ঠিক বলিনি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ। আর ঐদিন এই বাজেয়াপ্ত সিডিও চালাব কয়েকটা। খুব গরম মাল রাখে ব্যাটা ওর দোকানে।"

নিজেদের মধ্যে হাসিঠাট্টা করতে করতে পুলিশের দলটা থানায় ঢুকেই অরবিন্দর অগ্নিদৃষ্টির সামনে পড়ল। চমকে গেল সবাই।

"তারপর, বলুন, আর্জেন্ট ডিউটি সারা হ'ল আপনাদের?"

"হ্যাঁ, মানে, ইয়ে, আ-আপনার পরিচয়টা?" ইন্সপেক্টর থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"স্যার এঁরা একটা রিপোর্ট লেখাতে এসেছিলেন। এঁদের হাউসিং কলোনী থেকে কারা যেন একটা গাড়ী ছিনতাই করে পালিয়েছে।" পিছন থেকে সেই কনস্টেবল বেশ খোশমেজাজে সামনে এসে জানাল ওপরওয়ালাদের।

"ও। আজকাল অবশ্য গাড়ী চুরি খুব বেড়ে গেছে। নতুন গাড়ী ছিল কী?" জিনিসটা একটা ছোটখাটো চুরির বেশী কিছু নয়, সেই শুনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন ইন্সপেক্টর।

"স্রেফ গাড়ী চুরির ব্যাপার নয় এটা, গাড়ী চুরির সঙ্গে জড়িয়ে আছে দুটো জীবনের প্রশ্ন। তাদের আর জীবিত ফেরৎ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে? আপনাদের সব আর্জেন্ট কাজকর্ম ছিল, তার তুলনায় এ তো মামুলি ঘটনা - কী বলেন? মাত্র দুটো জীবনের মামলা - কয়েকটা হুইস্কির বোতলের তুলনায় তার দাম তো নগণ্য।" চাপা আক্রোশে অরবিন্দর গলা থরথর করে কাঁপছিল।

ধপাস করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে ইন্সপেক্টর অরবিন্দকেও ইঙ্গিতে বসতে বললেন। ধমকের সুরে কনস্টেবলের কাছে জানতে চাইলেন, "এই সাহেবের আসার খবরটা আমাকে দাওনি কেন? হ্যাঁ?"

"স্যার, আপনিই তো বললেন আপনারা খুব আর্জেন্ট কাজে যাচ্ছেন, যেন বিরক্ত না করি। সেটাই আমি ওঁদের বলেছি।" কনস্টেবল কোনোরকমে আমতা আমতা করে বলল।

"ইডিয়ট!! ফোন করতে পারোনি একটা?" আবার ধমক খেল বেচারা।

"ও ফোন করবে কী? আপনাদের ফোন তো কয়েকদিন ধরে খারাপ শুনলাম।" অরবিন্দ বাধা দিয়ে বললেন।

"ওঃ, তাই নাকি? আচ্ছা দেখছি - আসলে জানেন তো, এখানে মাঝে মাঝেই তার ঢিলে হয়ে যায়, লুজ কানেকশন হয় - এই তো, এই দেখুন, জাঙ্কশন বক্সের একটা স্ক্রু ঢিলে হয়ে গেছে, সেইজন্য ফোন কাজ করছিল না। এই রামদীন, এদিকে শোনো। একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে এসে এই প্যাঁচটা টাইট করে দাও। তুমি তো একটু খেয়াল করে দেখবে, কেন অকেজো হয়ে আছে ফোনটা?" শেষ কথাটা আবার কনস্টেবলের উদ্দেশ্যে বলা।

"হ্যাঁ, এবার বলুন তাহলে - ঘটনাটা ঠিক কী হয়েছিল। ছিনতাই কখন, কীভাবে, কোথায় হয়েছিল?" ছিনতাই-এর পাক্কা দু-ঘন্টা পর থানায় রিপোর্ট লেখানোর কাজ শুরু হ'ল। অরবিন্দ মুখ খোলার আগেই ফোন বেজে উঠল ঝনঝন করে। তাড়াতাড়ি রিসিভার কানে লাগালেন ইন্সপেক্টর। ওপ্রান্ত থেকে আসা খবর নিশ্চয়ই গভীর দুঃসংবাদ। ইন্সপেক্টরের মুখের রং বদলে যাচ্ছিল ক্রমশঃ।

"ও কে, আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। আপনি কে বলুন তো? কোত্থেকে বলছেন? হ্যালো? হ্যালো?..." ওপ্রান্ত থেকে ফোন কেটে দেওয়ার শব্দ পাওয়া গেল।

ইন্সপেক্টরের মাথা-মুখ ঘেমে উঠেছে, তাড়াতাড়ি একটা রুমাল দিয়ে মুছে তিনি উঠে দাঁড়ালেন।

"কী - কী হ'ল ইন্সপেক্টর? কোনো বিশেষ খবর আছে?" অরবিন্দর বুকটাও মুহূর্তের জন্য ধড়াস করে উঠেছে।

"একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি খবর দিল, শহরের শেষপ্রান্তে যে পুরনো নালাটা আছে তার ধারে দুটো লাশ পড়ে আছে। একজন লোক আর একটা অল্পবয়সী মেয়ে। আমাকে - আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে। সরি।"

"এখন আর কোথায় যাবেন, কেন যাবেন, ইন্সপেক্টর? মৃতদেহের জবানবন্দী নিতে? নাকি স্রেফ তাদের শনাক্ত করতে?" অরবিন্দর গলায় অবরুদ্ধ কান্না, "আপনাকে কষ্ট করে যেতে হবে না, আমি এখানে দাঁড়িয়েই ওদের শনাক্ত করে দিচ্ছি। একটা লাশ আমার প্রাক্তন সহকর্মী রবীন্দ্র বর্মার আর অন্যটা তার কিশোরী মেয়ে পূজা বর্মার। আমি ওদেরই রিপোর্ট লেখাতে এসেছিলাম ইন্সপেক্টর, ওদেরই। দেখুন তো, এখন রিপোর্টটা কত ছোট হয়ে গেল, কত পরিশ্রম বাঁচল আপনার - "

"কিন্তু - কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে ওদুটো অন্য কারুর। যতক্ষণ গিয়ে না দেখছি ততক্ষণ -"

"সবকিছু দেখা হয়ে গেছে আমার - সবকিছু - সমস্ত কিছু।" আর্ত চীৎকার করে উঠলেন অরবিন্দ, "গত দুঘন্টা এই থানায় আমি যা দেখলাম, আমার অবাক লাগছে এই দেশে, এই রাজ্যে, এই শহরে আমি এত বছর নিরাপদে বেঁচে রইলাম কী করে? চিন্তা করবেন না, এ-শহরে এরপর থেকে আপনাদের জীবন আরও শান্তিপূর্ণ হয়ে যাবে। নিশ্চিন্তে হুইস্কি খেতে পারবেন।

কেন জানেন? কারণ এর পর বিপদে-আপদে আমরা আর আপনাদের কাছে আসব না - লক্ষ্মণ সিংদের কাছে যাব।"

"কী বলছেন কী যা-তা? শান্ত হন -"

"একদম ঠিক বলছি। একদম পাক্কা কথা। আর যদি আপনারা কখনো লক্ষ্মণ সিংদের গায়ে হাত তুলতে আসেন, তাহলে আমাদের লড়াই হবে আপনাদের সঙ্গে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্সপেক্টর, থ্যাংক ইউ -" বলতে বলতে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন অরবিন্দ, দারোগার কিংকর্তব্যবিমূঢ় মুখের ওপর থানার অফিসের দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে।

শিল্পী : নমিতা রায়চৌধুরী

অসম্পূর্ণ কবিতা

উদ্দালক ভরদ্বাজ

আমার অসম্পূর্ণ কবিতাগুলো এখন
আমায় দেখে অবাক হয়ে যায়।

একদিন নির্দ্বিধায় শব্দ এসে
ভিজিয়ে যেত ভালবাসার মাটি,
একদিন মাটিতে স্পষ্ট ছিল চরণচিহ্ন।
এখন শুকনো হাওয়ায় -
ঠোঁট-ফাটা, অন্ধকার সন্ধ্যার হাহাকার।
স্বপ্নের তিস্তা আর পাঠায় না ঢেউ,
শুকিয়েছে উদগ্রীব লালা
পায়ের পাতার নির্জন রক্তাভা -
এখন শূন্যগামী সন্ধ্যায়,
খোঁজে না স্বপ্নের দোসর আর।

শূন্যভাসি কিছু শব্দ, টুকরো পালকের মতো
ভেসে এসে পড়ে তবু কোলে
কোনও এক শ্রাবণ বিকেলে।
কারো নিরুৎসুক হাতের ছোঁয়া,
ঠোঁটের মসৃণে ঠিকরে যাওয়া নিয়ন -
মুহূর্তে জাগায় স্পৃহা।
ক্লান্ত মন আবার অবসর খোঁজে,
যেতে চায় পুণ্য-প্রশমনে।

দ্বিধার সংশয়-ছুরি
মেঘ চিরে চলে যায় তবু,
ফেলে যায় দু একটা নির্বাক শব্দ,
অসংলগ্ন, উদ্দেশ্যহীন, নৈর্ব্যক্তিক উদ্গার;
ওরাও জানে এখন
সমস্ত ঝড়েরই প্রস্তুতি লাগে
সমস্ত ট্রেনের একটা টাইম টেবিল;
কোনও ঘটনাই আপনি ঘটে না, ঘটবেও না আর;
চলে গেছে কাঙ্ক্ষিত সময়
তাকে আর যাবে না পাওয়া কোনও দিন।

প্রবাস বন্ধু

শারদীয়া সংখ্যা ১৪২৬ (2019)

প্রবাস বন্ধু পত্রিকায় আমরা শুধুমাত্র বাংলা লেখা প্রকাশ করি।
যাঁরা এই পত্রিকায় লেখা বা আঁকা পাঠাতে ইচ্ছুক,
তাঁরা স্বরচিত প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠান।
কেবলমাত্র Google বাঙলায় টাইপ করা লেখা নেওয়া হবে।
https://www.google.com/intl/bn/inputtools/try/ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে টাইপ করুন।
লেখা pdf করে পাঠাবেন না। ওয়ার্ড-এ পাঠাবেন। প্রসঙ্গত Vrinda টাইপও ঠিক হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা:

Malabika Chatterjee
7614 Westmoreland Drive
Sugar Land, TX 77479
e-mail address: c.malabika@gmail.com

অথবা

Sujay Datta
41 Rotili Lane
Copley, OH 44321
e-mail address: sujayd5247@yahoo.com

সাহিত্য সভার সভ্য হবার বাৎসরিক চাঁদা পরিবার পিছু ২৫ ডলার।
প্রতি মাসের শেষ রবিবার সাহিত্য সভার অধিবেশন পরিচালিত হয় বিভিন্ন সভ্যের বাড়িতে।
বছরে দুবার (নববর্ষ সংখ্যা ও শারদীয়া সংখ্যা) 'প্রবাস বন্ধু' পত্রিকা প্রকাশিত হয়।
রবি ও চন্দ্রা দে-র বাড়িতে পাঠচক্রের গ্রন্থাগারে বেশ কিছু বাংলা বই ও বাংলা ছায়াছবির ডিভিডি আছে।
সেগুলি সভ্যরা ব্যবহার করতে পারেন।
সাহিত্য সভার সভ্য হওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন রবি ও চন্দ্রা দে-র ঠিকানায়।

Rabi & Chandra De
8 Prospect Place
Bellaire, TX 77401
Phone: 713-669-0923
e-mail address: rabide@yahoo.com

শুভ শারদীয়া